ওঁ

শান্তিপথ গ্রন্থাবলী, নং ২

# শুভমুহূর্ত।

বা

( পূজ্যপাদাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ স্বামী নিষ্কল চৈতন্য ভারতী মহারাজের জীবনীর এক অধ্যায় )।


শ্রীমৎ অদ্বৈত চৈতন্য ব্রহ্মচারী

প্রণীত।



প্রথম সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীমৎ অসীম চৈতন্য ব্রহ্মচারী

শান্তিমঠ, পোঃ কাঁচড়াপাড়া, জেলা ২৪ পরগণা।

কার্ত্তিক প্রেস,

২২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা,

শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# গ্রন্থকারের নিবেদন।

মহাপুরুষদিগের আশ্চর্য্য প্রভাব-সম্পন্ন কীর্ত্তি-কলাপ—যাহা বিশ্ব-মানবের পরমাদর্শ এবং সমগ্র জীব জগত যাহা হইতে অভয় প্রাপ্ত হয়, সেই অমৃতোপম চরিত্রলীলা নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে অনুষ্ঠিত হইলেও অপ্রকাশিত থাকে না। কেননা, কোন সূত্রে উহা সাধারণ্যে প্রচার হইয়া পড়ে। হে ধর্ম্মপ্রাণ মহোদয়গণ! আপনাদিগের মধ্যে যদি কাহারও এমন জ্বলন্ত সত্য কথায় বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে, তাহা হইলে আমার একটি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা করুন; দেখিতে পাইবেন—আলোক যেমন অন্ধকারকে অপসারিত করে, বিদ্যা যেমন অবিদ্যার প্রভাব হইতে আত্মাকে মুক্ত করে, সেইরূপ সংশয় মোচনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারিবেন অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার এই দুর্ব্বুদ্ধি সম্পন্ন দুষ্কৃতাত্ম নগণ্যের প্রতি আর অন্যদিকে ঐ অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন দেব-দুর্ল্লভ চরিত্র স্বামীজীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আপনাদের সংশয় অবিশ্বাস ধুইয়া মুছিয়া যাইবে। অত্যুজ্জল মহিমা-মণ্ডিত মহাপুরুষের চরিত্র লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আজ মাদৃশ অতি সাধারণ অধম ব্যক্তি লেখনি ধারণ করিয়াছে ইহা কি বিড়ম্বনার কথা নহে! অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় আমি উন্মাদ গ্রস্ত বাতুল নহি। কেননা, মহাপুরুষের চরিত্রানুশীলন করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করা দুই শ্রেণীর লোকে সমর্থ। এক—তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ, দ্বিতীয়—পূর্ব্বাপর বিবেচনা শূন্য বাতুলেরা। প্রথমটির সহিত তুলনার দায় হইতে আমি জন্মাবধি মুক্ত আছি। সংসারে, স্কুল কলেজে ও বন্ধুবর্গের

নিকট একদিনের জন্তও আমি বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসিত হই নাই ; সুতরাং প্রতিভাবান হিসাবে লিখিবার অধিকার আমাতে আদৌ খুঁজিয়া পাইবেন না। এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ বাতুলের কথা। গ্রন্থ প্রণয়নের প্রথম সংকল্পকালেই ঐরূপ উপাধি প্রাপ্তির ধারণা আমি নিজেই আঁচিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু স্বামীজীর নিষ্কাম স্নেহ বর্ষণে সেটী হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি কেননা, কোন সময় স্বামীজী কোন ব্যক্তিকে কিছু বলিবার জন্য আদেশ করিলে আমি বলিয়াছিলাম—"উহা কি আমা দ্বারা সম্ভব ? কি জানি কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিব।" প্রত্যুত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন—"কেন পারিবে না ? তুমি ত আর বাতুল নও ?" মহাপুরুষের বেদ-বাণী সেইদিন হইতে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে—আমি বাতুল নহি। এখন একবার আপনারা বুঝিয়া দেখুন, মহাপুরুষের চরিত্র সঙ্কলন করা আমার পক্ষে কিরূপ অসম্ভব। তবুও যে আজ আমি এই দুরূহ, অসামান্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিয়াছি, ইহা সেই অলোক-সামান্য মহাপুরুষের অমোঘ প্রেরণার প্রভাবে। তাঁহার পবিত্র জন-হিতকর চরিত্র অপ্রকাশিত থাকা অসম্ভব বলিয়া আজ চাষার হাতে শালগ্রামের ভারার্পণ করা হইয়াছে। এখন আপনাদের সংশয় অপনোদন হইল ত ? ওগো! "যাঁর কর্ম্ম তিনি করেন লোকে বলে করি আমি।"

গ্রন্থখানা আমার জীবনের "শুভ-মুহূর্ত্ত" অবলম্বনে লিখিত হইলেও প্রসঙ্গক্রমে ইহার মূল সূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে আমার পরমারাধ্য আচার্য্যদেব **শ্রীশ্রীমৎ স্বামী শঙ্করচৈতন্য ভা[illegible]জী** মহারাজের বিরাট জীবনীর এক ক্ষুদ্র অধ্যায় অবশ্য মহাপুরুষের জীবনীর ষোলকলা পূর্ণ করিয়া কেহ কোনদিন আঁকিতে পারিয়াছেন কিনা বলিতে পারিব না বা সেরূপ দুঃসাহসিকতা আমার মধ্যে নাই ; তবে স্বামীজীর বিশদ

জীবনী প্রকাশ করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করি, একথা অস্বীকার করিতে চাহিনা। সহৃদয় পাঠক আমাকে হয়ত প্রশ্ন করিয়া বসিবেন—"শাস্ত্রকারেরা কামনা পরিত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন, আপনি কেন সেই আকাঙ্ক্ষার প্রশ্রয় দিয়া মুক্তির পথে কণ্টক রোপিত করিতেছেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বহু যুক্তি-তর্কজালের অবতারণা করিব না, সামান্য দুইটি কথা বলিব মাত্র। প্রথমতঃ মহাপুরুষের চরিত্রালোচনায় হৃদয় পবিত্র হয়, সমস্ত বন্ধন শিথিল হইয়া যায়—নূতন করিয়া আসক্তি জন্মাইতে পারে না। দ্বিতীয় কথা—যদি তাহাও না হইত, সেজন্য আমি শঙ্কিত হইতাম কি না সন্দেহ; কেননা, প্রাণ আমার দেখিতে চাহিয়াছে—যে দেবতার আদর্শ চরিত্র বিশ্বজগতে প্রচারিত হইয়া মানবকে বিশ্বমানবতায় অনুপ্রাণিত করুক, মুক্তির অনন্তাকাশে কামনাবদ্ধজীব আনন্দভ্রমণে বহির্গত হউক, মাধুর্য্য প্রেমের স্নিগ্ধ প্রবাহে অবগাহন করিয়া তাপিত হৃদয় জুড়াইয়া যাউক। ইহাই আমার প্রযত্নের সার্থকতা। তবে শঙ্কা হইতেছে,—আমি অনধিকারী বলিয়া; পদে পদে আমার ভ্রম, ত্রুটী ও অপরাধ হওয়া সম্ভব এবং তজ্জন্য প্রত্যবায়ভাগী হইবার কথাও মনে উঠে। কিন্তু অপরদিক দিয়া মহাপুরুষের অমিয় চরিত্র ভক্তবৃন্দের পরম উপভোগ্য বিষয়, সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে কিছু না কিছু আনন্দের স্ফূর্ত্তি হওয়াও অসম্ভব নহে। তাই ভাবিতেছিলাম একদিকে ধর্ম্মপ্রাণভক্তবৃন্দের আশীর্ব্বাদের দিব্য তেজ, অন্যদিকে অনধিকার চর্চ্চার প্রত্যবায়, উভয়দিকে তাকাইয়া একটা মিটমাটের আশাও করিতে পারি। বলিতে পারেন—অপবিত্র হস্তের দান ভক্তগণের কখন আনন্দোদ্দীপক হইতে পারে না, এ কথা আমি অস্বীকার করি; কেননা, ব্রাহ্মণের হাত দিয়া হউক অথবা চণ্ডালের হাত দিয়া হউক গুড় আস্বাদনকারীর মিষ্টতা একপর্য্যায়ে

অনুভূত হয়। অধিক কথাবই বা কি প্রয়োজন? আমি এই প্রিয় বস্তুটীর লোক-শিক্ষা-পটু চরিত্র প্রচারের বিনিময়ে অনন্ত নরকভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি। এক ব্যক্তির পতনের বিনিময়ে যদি হাজার হাজার ব্যক্তি উদ্ধার পায়, আনন্দের সহিত আমি এমন পতন বরণ করিয়া লইতে পারি। স্বামীজীর মুখেই অনেকদিন শুনিয়াছি - "পাপীদের সহিত আনন্দে আমি নরকবাস করিতে পারি কিন্তু বৈকুণ্ঠে বসিয়াও পতিতদিগের স্মৃতি বোধ হয় নরক অপেক্ষাও ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক।"

ধর্ম্ম-প্রাণ পাঠক বর্গ! খুব বড় একটা ত্রুটী লইয়া আজ আমি আপনাদের দ্বারস্থ হইতেছি স্বামীজীর সহিত পুরীতে যখন আমার প্রথম দর্শন হয় সেই সময় ন্যূনকল্পে দুইমাস যাবৎ তাঁহার পুত সঙ্গে যাপন করি এই "শুভ মুহূর্ত্তের" ঘটনাগুলি সেই সময় সংঘটিত হইয়াছিল তবে এতদিন উহা সঞ্চিত ছিল অন্তঃকরণে, কাগজ কলমের হেপাজাতে যায় নাই। সুতরাং এই দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল কোণ ঠাসা হইয়া অবস্থান করাতে কিয়দংশ পচিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে আসল কথা হইতেছে, ঘটনার তারিখগুলি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি কাল কবলিত উহার মধ্যে দোল পূর্ণিমা ও চন্দ্রভাগা গমন এই দুইটী বিশিষ্ট তারিখ একেবারে ভুলিতে পারি নাই আন্দাজে তারিখগুলি গুছাইয়া লওয়া যাইত, কিন্তু তাহার অধিকাংশ যথাযথ মিলিবার সম্ভাবনা ছিল, আবার নাও ছিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তারিখের উল্লেখ করিলাম না। ইহা যে সময়ের ঘটনা সে সময় স্বামীজীর অপূর্ব্ব চরিত্রের মূল্য নিরূপণ করিতে সক্ষম হই নাই। তখন আমি বুঝিতে পারি নাই যে ইহা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে—অসংখ্য ধর্ম্ম-ভ্রাতাগণের গচ্ছিত নিধি। স্বপ্নেও ভাবি নাই একদিন এই ত্রুটীর জন্য আমাকে কৈফিয়ৎ

দাখিল করিতে হইবে। আজ আমার চোখ ফুটিয়াছে—মর্ম্মে মর্ম্মে লজ্জিত হইতেছি ; অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইলেও, হে অক্রোধ পরমানন্দ স্বরূপ ভক্তবৃন্দ ! আপনাদিগের নিকট ত্রুটী মার্জ্জনীয় অবশ্য প্রতিশ্রুত হইতেছি এখন হইতে সতর্ক থাকিব

মহাপুরুষের উচ্চ ভাব ও চিন্তা সমূহ সঙ্কলন করিবার ভাষা—মূর্খ আমি, কোথায় পাইব ? সুতরাং অনেক স্থলে হয়ত একরূপ সাজাইতে গিয়া অন্য প্রকার আঁকিয়া বসিয়াছি, হয়ত "তেটে কতা" বোল তুলিতে গিয়া "ধাগা ধাগা" উঠিয়াছে—সেই সমুদয় স্থলে আপনারা একটু প্রণিধান করিবেন। আমার মূর্খতার দোষে যেন অকলঙ্ক মহাপুরুষ-চরিত্র অন্য ভাবে সমালোচিত না হয়, ইহা আমার একান্ত প্রার্থনা।

অনবধানতা বশতঃ ক্ষুদ্র অক্ষরে গ্রন্থখানি ছাপা হইল। যখন এই ভ্রম ধরিতে পারিলাম তখন গ্রন্থের অর্দ্ধ কলেবর মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণে এই ভ্রম সংশোধন করিবার আশা রহিল। ব্যস্ততাবশতঃ মুদ্রারোগও সম্পূর্ণ নিরাময় হয় নাই

স্বামীজীর জীবনের অপর এক অধ্যায় শীঘ্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল এই উদ্দেশে সময়ের অভাব সন্ন্যাসীর নাই, তবে অর্থাভাবটাই প্রবল। অলমিতি বিস্তরেণ—

শান্তি মঠ,
পোঃ কাঁচড়াপাড়া,
জেলা ২৪ পরগণা
বৈশাখ, ১৩৩১ সাল।

শ্রীমৎ অদ্বৈত চৈতন্য ব্রহ্মচারী।

বর্তমান প্রতিকৃতি ৮০ বয়স

শ্রীমৎ স্বামী নির্মল চৈতন্য ভারতী মহারাজ

১৩৫০ সাল।

ওঁ

# শুভ-মুহূর্ত।

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

## ১

## লোকমুখে

সে আজ ছয় বৎসরের কথা। ১৩২৬ সালের শীতের প্রারম্ভে মহাবীর নিমোনিয়া রোগের সহিত আমার এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল। অনেক ধস্তা-ধস্তির পর একেবারে শেষ করিতে না পারিয়া অর্দ্ধমৃতাবস্থায় আমাকে ফেলিয়া যায়—লাঞ্ছনার একশেষ আর কি! ধাক্কা সামলাইয়া শরীরে যখন একটু সামর্থ্য বোধ হইল, সেই সময় চিকিৎসকের হিতকর আদেশ অমান্য করিতে না পারিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে হইল। স্বজনবর্গের সমর্থিত যুক্তিঅনুসারে অবিলম্বে বৈদ্যনাথ উদ্দেশে রওনা হইলাম। ও হরি! মানুষ ভাবে এক, হয় অন্য। হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া মত উল্টাইয়া গেল—টিকিট কিনিবার সময় অন্তরালে অবস্থিত কোন এক অজানা রাজ্যের অকাট্য বিধান আমাকে নিয়ন্ত্রিত

বৈদ্যনাথের পরিবর্ত্তে পুরী যাত্রা ও শুভ মুহূর্ত্তের সূচনা

করিল ; বৈদ্যনাথের পরিবর্ত্তে পুরী যাত্রা করিলাম। তখন কে জানিত, সহসা এই মত পরিবর্ত্তনের মূলে এক গভীর রহস্য বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ইহাই আমার জীবনের শুভ মুহূর্ত্তের সূচনা। ঘটনার নিয়ন্তা পরে তাহা আমাকে জানিবার সুযোগ দিয়াছিলেন ; একটু অপেক্ষা করুন, আপনারাও সে আনন্দ সংবাদ পাইতে বঞ্চিত হইবেন না।

সঙ্গে ছিল, প্রয়োজনীয় আসবাব ও সেবা শুশ্রূষার জন্য একটি মাত্র লোক। ব্যয়-বাহুল্য ভাবিয়া হউক অথবা সাংসারিক কোলাহল বর্জ্জিত শান্তি খুঁজিয়া হউক বাটীস্থ কাহাকেও সঙ্গে লই নাই। একাকী যাওয়ার মধ্যে বোধহয় ঐ দুইটী কারণই নিহিত ছিল। যাহা হউক সে জন্য আমাকে বড় একটা অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। কেননা, দেহ রাজ্যে তখন প্রায় স্বায়ত্তশাসন পাইয়াছি। বিদ্রোহ একরূপ ছিল না বলিলেই হয়, তবে সীমান্ত-বাসী দস্যুবৃন্দের মত সর্দ্দি-কাশীর অত্যাচার মধ্যে মধ্যে সহ্য করিতে হইত। পুরী পৌঁছিয়া আয়তনে ক্ষুদ্র একটা বাড়ীতে বাসা লইয়াছিলাম—সমুদ্রের কিনারায়

আমার পূর্ব্ব স্বভাবের একটু পরিচয় দিতে বাধ্য হইতেছি, নচেৎ পরবর্ত্তী অবস্থা পরিস্ফুট করিতে অসুবিধা হইবে হৃদয়টুকু ছিল বরাবর ভাবপ্রবণ, ছাত্রজীবন হইতেই তাহার আস্বাদ পাইয়াছি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যক্রমে সেই ভাব-বৃক্ষটী হইতে শাখা প্রশাখাও গজাইয়াছিল। অবশ্য সেটা যে একেবারে নভেলি গন্ধ বর্জ্জিত হইতে পারিয়াছিল এ-কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না তবে আমি হিন্দুর ছেলে, বংশগত ধারায়—প্রাপ্য অধিকার আমাতেও বেশ খানিকটা বর্ত্তাইয়াছিল। স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বাপ মা পাড়া পড়সীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত জীবনের সেই সংস্কারাচ্ছন্ন অধ্যায়টী মুছিয়া ফেলিতে পারি নাই। ভাব আমাকে

পূর্ব্ব স্বভাবের পরিচয়। হিন্দুধর্ম্মের উপর নিষ্ঠা।

ধর্মভীরু করিয়াছিল, হিন্দু ধর্মের গণ্ডি উল্লঙ্ঘন করিবার সাহস দেয় নাই। ফলে আমি দেব দেবী, পূজা অর্চনা প্রভৃতিতে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিতাম, শাস্ত্র মানিতাম এবং তদনুযায়ী জ্ঞানানুশীলন করিতেও মন অভিলাষী ছিল। তবে ভাবশূন্য জ্ঞানকে আমি কখনও আমল দিতে পারি নাই; কিন্তু যে কোন প্রেমিক চরিত্র বিনা প্রতিরোধে আমার হৃদয়ে প্রভুত্ব স্থাপন করিত। বিশেষতঃ ব্রজের মাধুর্য্য ভাবটী আমাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল

তারপর জীবনের আর একটী অধ্যায় আরম্ভ হয়। এই অধ্যায়ে ছিল ধর্ম্ম ও কর্ম্মের একত্র সম্মিলন আদর্শ—বিবেকানন্দ। আপনারা যেন না ভাবেন—রামকৃষ্ণকে অতিক্রম করিয়া বিবেকানন্দের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি। আমার আদিম নিবাস ঐ ভাবরাজ্যে এবং স্বভাবগত বৃত্তি একমাত্র ভক্তি। তবে কি জানি কেমন করিয়া হৃদয়ে কর্ম্মের প্রেরণা আসিয়াছিল। একদিকে বজ্রনির্ঘোষে বুকে বাজিয়াছিল দেশের কাজ, আর একদিকে সেই চিরন্তন নিবদ্ধ সংস্কার ধর্ম্মানুরাগ ধর্ম্মের গণ্ডি উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশের কাজ কেন, কোন কাজ করিবার সাহস আমার কোনদিন হয় নাই। তাই অন্ধের মত হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া ধরিলাম বিবেকানন্দের কর্ম্মযোগ। কিন্তু কি জানি, ইহাকেও জীবনের চরমাদর্শ করিতে মন রাজী হইল না। থাকিতে পারে স্বামীজীর সমগ্র জীবনে মনুষ্যত্বের অত্যুৎকৃষ্ট বিকাশ; কিন্তু প্রাণ যেন আরও কিছু আদল বদলের স্বপ্ন কল্পনা করিতেছিল। সে অবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই, ভবিষ্যতের অন্ধকার গুহায় স্বীয় শান্তির খনি অন্বেষণে কোমর বাঁধিবার উদ্যোগ দেখা যাইত।

বিবেকানন্দী ভাব বা কর্ম্মযোগের অনুসরণ

আমার জীবনের একটা বিশেষত্ব ছিল—প্রারম্ভ হইতে যতগুলি

অবলম্বন ধরিয়াছি তাহাতে অসম্পূর্ণ বোধ। স্বীয় অবস্থাতে কোনদিন ঠিক ঠিক সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। বোধহয় এই কারণেই কোন বিষয়ের গোঁড়ামী আমার ভাল লাগিত না। কাহাকে কোন বিষয় লইয়া গোঁড়ামী করিতে দেখিলে মনে হইত ওটা ভাল নয়। মানুষের পদে পদে ভ্রম, সহসা কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাহার উচিত হয় না। অবশ্য আমার এই মতকে নিশ্চিত করিবার জন্য কোন দার্শনিক যুক্তি বিচারের সাহায্য লই নাই; ইহা যথাপ্রাপ্ত পারিপার্শ্বিক শিক্ষার ফল মাত্র স্বীয় প্রাণেও যদি কোন সময় গোঁড়ামী ভাবাপন্ন কিছু নিশ্চয়তা বাসা বাঁধিত, তাহা আমার উদ্বেগের কারণ হইত। আশ্বস্ত হইবার জন্য নিজেকেই প্রবোধ দিতাম, "অপূর্ণ বুদ্ধির এত তেজ কেন?" এইরূপ গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে মানসিক গতির পরিচালনা করা দোষ কি গুণ,তাহা বুঝিতে পারি নাই—চেষ্টাও করি নাই। খুব সম্ভব এই গোঁড়ামীর বিদ্রোহী হইয়া আমার মন নিষ্ঠা হারাইতে বসিয়াছিল—এবং সেই অনিষ্ঠা বশতঃ শীঘ্র শীঘ্র আমার মতেরও পরিবর্ত্তন ঘটিত। তবে পরিবর্ত্তনেরও একটু বিশেষত্ব ছিল—পুরাতনকে ধ্বংস করিয়া সাচ্চা নূতনের আমদানী হইত না, রূপান্তরিত পুরাতনই আমার নূতন সৃষ্টির সার্থকতা করিত। স্বাভাবিক ছিল সংস্কার আইনের বিশ্বাস—তাহাতে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য যেমনই হউক না।

গোঁড়ামীর বিরোধে। শাসনীতি ছিল না, সংস্কার আইন মানিতাম।

পাতা উল্টাইয়া জীবনের আর একটী অধ্যায়ে উপস্থিত হইলাম; নয়নে পড়িল—যোগীদের ঐশ্বর্য্য ও যোগের সহিত পারমার্থিক সম্বন্ধ। ভাবিলাম, বাঃ বেশ ত! যোগে মুক্তিও হয় অথচ সিদ্ধি লাভে পার্থিব ভোগের পথও প্রশস্ত হয়। তৎকালে রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকের

যোগ সাধনা ও তাহাতে বিফল মনোরথ।

কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। দেশের প্রতিও যথেষ্ট কর্ত্তব্যজ্ঞান ছিল যৌগৈশ্বর্য্যে প্রলোভিত হইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। অবিলম্বে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুযোগও উপস্থিত হইল। কেননা সন্নিকটেই একজন বিচক্ষণ হঠযোগী সাধুর সন্ধান পাইলাম। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন হঠযোগী ও রাজযোগীর তারতম্য বুঝিবার ক্ষমতা আমার হয় নাই। রাধাকান্ত নামক আর একটী স্নেহের সঙ্গীকে এই পথে টানিয়া লইয়াছিলাম। যথাসময়ে প্রবল উদ্যমে মহানন্দে তাঁহার নিকট আমাদের শিক্ষা আরম্ভ হইল পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত কিছু একাগ্রতা ছিল, তাহারই ফলে জ্যোতিঃদর্শনাদি ভেদে কিছু কিছু যৌগীক বিভূতিও দেখিতে পাইলাম। কিন্তু কই, তৃপ্তি কোথায়। প্রাণের জন্ম জন্মান্তর সঞ্চিত অভাব শান্তির আসন ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল না কিছুকাল এইরূপ ঘূর্ণায়মান জলস্রোতে ঘুরিয়া পরিশেষে ব্যাধি মকরের কবলে পরিলাম খুব সম্ভব অনিয়মে প্রাণায়াম করিতে গিয়া ফুসফুসের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল

আর একটী কথা বলিবার আবশ্যক বিবেচনা করি ভক্তিনিষ্ঠা সহকারে যাঁহার নিকট যোগ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম, তাঁহাকে কিরূপ চোখে দেখিতেছি? অবশ্য তিনি কিরূপ প্রকৃতির লোক, সে পরিচয় এখানে অনাবশ্যক। তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধার অভাব ছিল না, তবে গুরুর প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিলেন আপনারা যেন ভাবিবেন না, আমি গুরুবাদকে অবজ্ঞা করি; ধারণাটা উচ্চের ছিল বলিয়া সাধারণ হইতে উহা পৃথক বোধ হইত গুরুর আসন আমি এত উঁচুতে দেখিয়াছিলাম যে সাধারণ মানব সে অধিকারের দাবী করিতে পারে না—একমাত্র ভগবানের বিশেষ প্রকাশ মহাপুরুষ ছাড়া সমন্ধে ধারণা আরও

শ্রীগুরুর ধারণা।

ঊর্দ্ধে উঠিত, তখন গুরু ও ভগবানের কোন ব্যবধান দেখিতে পাইতাম না। মনে হইত—সময় হইলে ভগবান স্বয়ং গুরুরূপে ভক্তের সম্মুখে হাজির হন। ঠিক ঠিক ভক্তকে বঞ্চনা করা কঠিন, তাই ভগবান স্বীয় অসীম প্রেমের প্রকাশ নিয়া মানবরূপে প্রকট হইয়া থাকেন। তখন জীবের সর্ব্ব সংশয়শূন্য হয়, হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হয় পারে পৌঁছিবার আলোক পায়। আমার ধারণা ছিল, জ্ঞান-প্রেম দাতা সাকার ভগবানই শ্রীগুরু। মতান্তরে অনেকে বলেন যাঁহার নিকট একটি মাত্র অক্ষর শিক্ষা পাওয়া যায় তিনিও গুরু এইরূপ ধারণা পোষণকারীর নিকট এই যোগী সাধু আমার গুরু বটে

হে সজ্জন মণ্ডলী আপনারা এইবার একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন, স্বাস্থ্যোন্নতি কামনায় পুরী আসিলেও অন্তরালে আত্মোন্নতি কামনার বীজ থাকা অসম্ভব কিনা। যে পবিত্র স্থান বহু শতাব্দী হইতে বহু অবতার মহা পুরুষের কীর্ত্তিস্তম্ভ বহন করিয়া আসিতেছে,—সাম্য ধর্ম্মের প্রচার দেখিয়া যে স্থানটীকে মনে হয়, ইহা সাক্ষাৎ ভগবানের প্রকাশ ক্ষেত্র, সেখানে আমার মত ত্রিতাপ তাপিত পথ হারা পথিকের শান্তির আশা করা অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া মনে হয় না। তাই বলিতেছিলাম, আমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে বড় আশা ও উৎসাহ বুকে করিয়া আজ পুরুষোত্তম ধামে উপস্থিত হইয়াছি। "ঈশ্বর মঙ্গলময়" শব্দটী এতদিন লোকের মুখেই শুনিয়া আসিতেছিলাম, আজ তাহা বিশ্বাস করিবার জন্য মন রাজী হইয়াছে। আমার পীড়া, ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিলাম, যাহা আমাকে জীবনের এমন পবিত্র সুযোগ ইয়া দিয়াছে।

পুরুষোত্তম যাত্রার দুইটী কারণ—স্বাস্থ্যোন্নতি ও আত্মোন্নতি।

তে আসিয়া আমার দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে বিশিষ্ট হইয়া

দাঁড়াইয়াছিল দুইটি বিষয়—আহার ও বিহার বিহারের স্থান সমুদ্রতীরটাই প্রশস্ত ছিল, কখন মন্দিরের পথেও আনন্দের সহিত অগ্রসর হইতাম।

স্বামীজীর সংবাদ। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখিয়া প্রাণের তীব্র ইচ্ছা আমাকে সংযত রাখিতে হইত—৺জগন্নাথ দর্শনে যাওয়া ইচ্ছানুসারে ঘটিয়া উঠিত না। ধীরে ধীরে দু' একটী বন্ধুও জুটিতেছিলেন, যাহারা আমারই মত কর্ম্ম শূন্য সময়টাকে গল্প গুজবের ভিতর দিয়া অতিবাহিত করিতে লালায়িত। অপরাহ্নে সমুদ্র তীরে অনেক আড্ডা বসিত, বেড়াইতে গিয়া দু' একটী আড্ডায় যোগদান ও করিতাম অবশ্য সকল আড্ডায় মেশা অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিত না আড্ডায় অনেক প্রসঙ্গ উত্থাপন ও আলোচনা হইত; অনেকের রাজ্য সৃষ্টি ও সর্ব্বনাশ এক মিনিটে সাধিত হইত যাহা হউক সমুদ্রতীরে সেই সমুদয় কথা-সমুদ্রের মধ্যে একটী প্রসঙ্গ আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল—হৃদয়ে কৌতূহল জাগাইয়াছিল। যে প্রসঙ্গটী শুনিবার জন্য কর্ণ সর্ব্বদা সমুৎসুক হইয়া থাকিত, সেটী হইতেছে একজন স্বামীজীর কথা স্বামীজী শব্দটী পূর্ব্ব হইতেই একটু প্রিয় ছিল, কেননা উহা দ্বারা বিবেকানন্দকে লক্ষ্য করিবার একটা সংস্কার সংগ্রহ করিয়াছিলাম বোধ হয় সেই সংস্কারের প্রভাব এখানকার স্বামীজীর আলোচনায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। আলোচনা প্রায় এইরূপ হইত :—

কেহ বলিতেছেন—আজ স্বামীজীর সহিত প্রায় দু'ঘণ্টাকাল সমুদ্রে স্নান করিয়াছি তিনি যেন ভব-সমুদ্রের কাণ্ডারীর মত সকলের আগে

সাধারণের মুখে স্বামীজীর সমালোচনা। ঢেউ ভাঙ্গিয়া অভয় দিতে দিতে অগ্রসর হন, আর আমরা পশ্চাতে তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া নির্ভয়ে ঢেউ অতিক্রম করি। স্বামীজী যখন নুলিয়াদের টুপী মাথায় দিয়া স্বদলে তরঙ্গের সাথে নৃত্য করেন, তখন এক

মনোমুগ্ধকর দৃশ্য হয় বটে। গানের সময় স্বামীজী না থাকিলে তেমন জমাট আনন্দ হয় না। যাহা হউক, লোকটীর অদ্ভুত সাহস।

আর একজনের নিকট শুনিলাম—গতকল্য রাত্রিতে বিনোদবাবুর বাসায় প্রায় ১১টা অবধি আনন্দের বৈঠক বসিয়াছিল স্বামীজী কোথ হইতে একজন ভাল গায়ক পাকড়াইয়া এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন। গান বাজনা চলিতেছে, এমন সময় স্বামীজীকে একটী গাইবার জন্য অনুরোধ করা হইল। অনেক বলিবার পর তিনি হারমোনিয়াম লইয়া গাইতে আরম্ভ করিলেন দুটী একটী চরণ গাইবার পর তাঁহার স্বর যেন ক্রমশঃ ভাঙ্গা ভাঙ্গা—সকলে লক্ষ্য করিল স্বামীজীর চোখে জল ভরিয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে স্বামীজীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, বৈঠকও একেবারে নীরব—নিস্তব্ধ। যাই বল লোকটা বেশ ভাবুক।

অন্যস্থানে একজন বলিলেন—স্বামীজী খুব জ্ঞানী এই সেদিন সমুদ্র তীরে বসিয়া কয়েকজন ভদ্রলোক গীতার সমালোচনা করিতেছিলেন, বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজীও সেখানে উপস্থিত। উপবিষ্ট ব্যক্তি-বর্গের মধ্যে কেহ কেহ স্বামীজীকে জানিতেন। জনৈক ভদ্রলোক স্বামীজীর মতামত জানিবার জন্য অনুরোধ করায় সকলেরই সেইদিকে দৃষ্টি পড়িল, এবং তাঁহার বক্তব্য শুনিবার জন্য উদগ্রীব হইলেন। অগত্যা তিনি গীতার আভাস সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করেন। প্রায় একঘণ্টাকাল সেই সকল জ্ঞান-গম্ভীর বচন বিন্যাস সকলে মন্ত্র-মুগ্ধবৎ নীরবে শুনিয়াছিলেন বাক্যগুলি যেমন সারগর্ভ, বলিবার ভঙ্গিমাও তেমনি মধুর। বক্তৃতাকালে আরও বহু শ্রোতা সেখানে জমিয়া গিয়াছিল, সমগ্র জনমণ্ডলী এক বাক্য প্রশংসা করিয়াছিল।

স্বামীজীর সম্বন্ধে এইরূপ যে শুধু এক চেটিয়া প্রশংসাই শুনিয়াছিলাম

তাহা নহে ; এ সম্বন্ধে দু' একটী প্রতিপক্ষের মন্তব্য শুনিলে আপনারা পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন একজন অপরকে বলিতেছেন—মহাশয় —দেখুন ! এই স্বামীজী লোকটীকে আমার বিশেষ সন্দেহ হয়, লোকটী ডিটেক্‌টিভ না হইয়া যায় না গায়ে পড়িয়া পরিচয় করে, দু' একটী কথায় কেমন লোকের সাথে ভাব করিয়া নেয়, সকলেরই খবর রাখে এর কারণ কি ?

কেহ বলিলেন—কত রকমের ভণ্ড আছে—নির্ণয় করা মুস্কিল শুনিয়াছ, কোথা হইতে এক পাতাল ফোঁড় স্বামীজীর সমাগম হইয়াছে ; তাঁহার ধরণ আজব রকমের পয়সা উপায়ের ফন্দিটা ভাল, দু' পয়সার রংএ অনেক পয়সা রোজগার হয় কলিকাল কিনা ! লোকটা যেন বহুরূপী—কখন লাল, কখন সাদা। অপরে বলিলেন লোকটা নিশ্চয়ই যাদু জানে

এইরূপ বিভিন্ন সমালোচনার ভিতর দিয়া পরোক্ষে স্বামীজীর সম্বন্ধে এক অদ্ভুত রকমের চিত্র আঁকিতেছিলাম কয়েকদিন পুরী আসিয়া প্রায় প্রত্যহই স্বামীজীর কথা শুনিতেছি ; দর্শনের ইচ্ছাও বলবতী হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজিও তিনি নয়ন গোচর হইলেন না তবে দর্শনের জন্য আগ্রহের সহিত অনুসন্ধান করি নাই। না করিবার কারণও যে কিছু ছিল না এমন নহে ; কারণ সম্বন্ধে পরে বলিব। তৎপূর্ব্বে লোক মুখে শুনিয়া স্বামীজীর সম্বন্ধে আমি কিরূপ ধারণায় উপস্থিত হইলাম তাহাই ব্যক্ত করিব আমার বহুদিনের ধারণা, মহাপুরুষ দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না—জন্ম জন্মান্তরীন সুকৃতি থাকা চাই মহাপুরুষগণ যদৃচ্ছা ভ্রমণকারী ও সর্ব্বগামী হইলেও পবিত্র তীর্থভূমিতে অধিকাংশ সময় যাপন করেন

স্বামীজী মহাপুরুষ কিনা ? অনুসন্ধান করিয়া সাক্ষাৎ না করিবার কারণ।

তাই পুরী প্রবেশ করিবার সাথে সাথে মহাপুরুষ দর্শন লালসাও অন্তরে জাগিয়াছিল। সে জন্য চক্ষু ও মন দুজনে যুক্তি করিয়া আমাকে বিব্রত করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। যখন আমি ৺জগন্নাথ মন্দিরে দর্শনে যাইতাম চক্ষু যেন ইতস্ততঃ কাহার অন্বেষণে সঞ্চালিত হইত; কখন বা ফেনিল নীল-জলধির পানে তাকাইয়া "মহা সিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসিবার' অপেক্ষা করিতাম। তখন যেন সত্য সত্যই—কোন মহাপুরুষের আহ্বান বাণী শুনিবার জন্য কর্ণ উৎকণ্ঠিত হইত, হৃদয় বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িত। কবির কল্পনাকে মূর্ত্ত দেখিবার জন্য মন যেন জিদ্ করিয়া চঞ্চলতা প্রকাশ করিতেছিল। এই হইতেছে আমার অবস্থা। সেই উৎকণ্ঠিতাবস্থায় তড়িতালোকের মত স্বামীজীর মহাপুরুষত্ব ক্ষণিকের জন্য আমার প্রাণ আলোকিত করিতে বাধা প্রাপ্ত হইল না। কিন্তু প্রকৃত আলোক রাশী সংশয়-মেঘে আবৃত ছিল। কোন গুরুতর বিষয়ের মাঝখানে মানব-চিত্ত যে এমন দোদুল্যমান অবস্থা প্রাপ্ত হয় ইহা স্বাভাবিক, সুতরাং তজ্জন্য আমি বিচলিত হইলাম না। ঘটনা, স্থান, কাল ও পাত্র হিসাবে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই ছিল না। স্বামীজী আমার দৃষ্টিতে কখন দিব্য মহাপুরুষ বলিয়া অনুমিত হইতেছেন; আবার কখন মন্দ অভিপ্রায়ী প্রতারক ভাবিতেও কুণ্ঠিত হইতেছি না। যাহাই হউক স্বামীজীর চিন্তায় মন বেশ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

স্বামীজীকে দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইলেও ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিতে বিরত থাকিলাম। প্রথম কারণ হইতেছে মহাপুরুষ চিনিবার উপযুক্ত চক্ষু না থাকা। কি কি লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি মহাপুরুষ পদ বাচ্য তাহা আমার জানা ছিল না। মলিন ভ্রান্ত বুদ্ধি দ্বারা নির্ব্বাচন করিতে গিয়া শেষে এক বুঝিতে আর বুঝিব, শিব গড়িতে যাইয়া বানর গড়িয়া বসিব!

স্বামীজীর সহিত দেখা না করিবার তিনটী কারণ।

এইত সাধারণের নিকট স্বামীজীর সম্বন্ধে কত প্রকার শুনিলাম অনুসন্ধান না লওয়াই ভাল, যেমন আছি সেইরূপ থাকি এইটী প্রথম কারণ স্বামীজীর সহিত দেখা না করিবার দ্বিতীয় কারণটী বেশ সুন্দর ভাবিলাম, যদি তিনি প্রকৃত মহাপুরুষ হন তাহা হইলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণটুকু নিশ্চয়ই তাঁর অবিদিত নয়, প্রাণের কথা বুঝিয়া নিজে আমাকে ডাকিয়া লউন না। নিজগুণে তাঁহার গুপ্ত স্বরূপটুকু প্রকাশ করিয়া নিজেই আমাকে মহাপুরুষ চিনিবার উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করুন না! যদি আমার উপযুক্ত সময় হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সঙ্গত দাবী পূরণ করা কি মহাপুরুষের পক্ষে অসুবিধা জনক হইবে? ইহা ছাড়া আর একটী তৃতীয় কারণ ছিল, যাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে দুষ্ট বুদ্ধি বলিল, যদি তিনি মহাপুরুষ না হইয়া কোন স্বার্থাভিপ্রায়ী ব্যক্তি হন? শেষে কি মহাপুরুষ দর্শনের প্রলোভনে পড়িয়া ফাঁসাদ গ্রস্ত হইব? কি জানি কাহার ভিতর কি আছে।

২

## অদ্ভুত পুরুষ

বেলা আন্দাজ দুইটা বাজিবার উপক্রম। পুরীর স্বর্গদ্বার এই সময় স্বভাবতঃ একটু নীরব, নিস্তব্ধ থাকে রাস্তা জনশূন্য এবং সমুদ্রতীর কোলাহল বর্জ্জিত হইয়া দাঁড়ায় বিশেষতঃ আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও মাঝে মাঝে বিন্দু বিন্দু জলধারা পতিত হওয়ায় খুব বেশী নীরবতা বোধ হইতেছিল। সঙ্গে কয়েকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল। আহারান্তে শয্যা অধিকার

অদ্ভুত পুরুষের সহিত অপূর্ব্ব মিলন।

করিয়া প্রত্যহই সেইগুলি দেখিতাম। পূর্ব্ব পূর্ব্বদিনের মত আজও গ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশের চেষ্টা করিলাম, ভাল লাগিল না। সঙ্গীটীর সহিত দু' চারিটী প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপে সময় কাটাইবার চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হইতে হইল আড্ডার সুবিধা থাকিলেও এই সময়ের জন্য কোথায় কোন আড্ডা বসে কিনা, প্রায় পনের দিনের অভিজ্ঞতায় আমি তাহার সন্ধান পাই নাই তাম্রকূট সেবনের প্রয়োগ বিধি পূর্ব্ব হইতেই আমার জানা ছিল। মানসীক অসুস্থতা অধিক পরিমাণে দেখিয়া অনুপান তাম্বুল সহ পর পর তিন মাত্রা সেবন করিয়াও কোন ফল পাইলাম না ধৈর্য্যের বাঁধ আজ যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিছুতেই সংযত হইতে না পারিয়া অগত্যা বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

যাই কোথায়? অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে অনন্ত শয্যার দিকে অগ্রসর হইলাম যদিও কালটা তখন বর্ষাঋতু নয়, ফাল্গুনমাস, তাহা হইলেও দেবরাজ আজ সে নিয়ম রক্ষা করেন নাই একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাহিরে বেশ শীতল বায়ু বহিতেছিল, স্বাস্থ্যের প্রতিকুল হইলেও গ্রাহ্য না করিয়া শ্মশানের নিকটবর্ত্তী হইলাম মানব পরিণামের নিদর্শন লইয়া দুইটী চিতা শ্মশানবুকে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল; কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম পূর্ব্ব হইতেই মনটা উড়ু উড়ু ছিল, তারপর শ্মশানের ঐ বীভৎস দৃশ্যে আরও যেন কেমন হইয়া গেল। বিমর্ষ-চিত্তে দু'এক পা চালাইয়া দেহ-রথকে অনন্ত শয্যা পর্য্যন্ত টানিয়া লইলাম ভাগ্যক্রমে পার্শ্বস্থিত একটী ঘরের উন্মুক্ত বারান্দা হইতে নব পরিচিত একজন বন্ধু ডাকিলেন—"মশাই! এইদিকে আসুন, কেমন আছেন?" হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম ভদ্রলোকটীর সমীপবর্ত্তী হইলে বলিলেন "এমন দিনে ঘর থেকে বেরিয়েছেন, হাওয়াটা আজ ভারি অপ্রীতিকর"

বসিয়া প্রথমে স্বাস্থ্যতত্ত্বের আলোচনা শেষ করিয়া পুরী সম্বন্ধে আমার পনেরদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা নবাগত বন্ধুটীর জ্ঞান বুদ্ধিতে বাড়িয়া দিতেছিলাম কিছু সময় এইরূপ আলোচনার পর উভয়ের চক্ষু যুগপৎ অদূরে পথের উপর পতিত হইল উভয়ের দৃশ্য বস্তু একই দেখিলাম একজন ভদ্র-বেশধারী যুবক ধীর মন্থর গতিতে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন সমীপবর্ত্তী হইয়া আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই নিতান্ত পরিচিতের মত সহাস্যে বলিলেন—"ভারি মুস্কিল সময় আর কাটে না, কি করা যায় বলুন ত?" পরে আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন —"আপনি কি পাশা খেলা জানেন? খেলা ধুলো নিয়ে একটু থাক্‌লে হয়, সময় কাটান চাই ত?" আমার পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুটী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—"বসুন"

ধূমকেতুর মত হঠাৎ আবির্ভূত এই ভদ্রলোকটীর চেহারা ছিল যেমন সাধারণ, কথাগুলিও তেমনি সহজ ও সাধারণ; কিন্তু চিত্তাকর্ষক অদ্ভুত বোধ হইয়াছিল তাঁহার নয়নের দৃষ্টিটুকু মুখের উপর স্থাপিত বড় বড় সেই চক্ষু দুইটী যেন আমার অন্তস্থল ভেদ করিয়া হৃদয়ের সব অংশটাই দেখিয়া লইল। ভদ্রলোকটীর উপর দৃষ্টি পড়িবার পর হইতেই আমিও তাঁহার মুখপানে তাকাইয়াছিলাম, দৃষ্টি ফিরাইতে পারি নাই মুখখানিতে খুব সৌন্দর্য্য ছিল কিনা সে বিচার আমার দ্বারা সম্ভব নহে, তবে প্রাণ মন ভুলান একটা মাধুর্য্য যে তাহাতে ছিল এক বাক্যে তাহা আমি মানিয়া লইতে বাধ্য হাতে হাতে তাহার প্রমাণও পাইয়াছিলাম মুখখানির দিকে তাকাইয়া কিছু সময়ের জন্য আমার মন বুদ্ধি কার্য্যকরী অবস্থায় ছিল না, তাই তাঁহার প্রশ্ন শেষ হইয়া গেলেও উত্তর পান নাই। মুখখানি যেন খুব পরিচিত এবং আপনার বলিয়া বোধ হইল কিন্তু পরিচয়ের কোন নিদর্শন অনেক ভাবিয়াও বাহির করিতে পারিলাম না শীঘ্রই

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রকৃতিস্থ হইলাম তখন তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কথা মনে পড়িল তাঁহারই মত মৃদু হাস্যে ছোট একটী কথায় বলিলাম—"চলুন—আপত্তি কি, আপনি প্রাণের কথাই টেনে বের করেছেন—সময় কাটান ভারি মুস্কিল, বিশেষতঃ এই সময়টা ” বন্ধুটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "চলুন, যাবেন ?" বিশেষ কার্য্যানুরোধে তিনি আপত্তি জানাইলেন বন্ধুকে নমস্কার করিয়া আহ্বানকারী সেই মনোহর পুরুষটীর পশ্চাদানুসরণ করিলাম তখন কে জানিত, আজিকার এই দর্শন ও যাত্রার মুহূর্ত্তের মধ্যে অদ্ভুত রহস্য বিদ্যমান রহিয়াছে, কে জানিত এই মুহূর্ত্তটাকেই ভবিষ্যতে আমার জীবনের শুভ-মুহূর্ত্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে তখন বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারি নাই যে আজিকার এই যাত্রা আমাকে অসীমের পথে ভুলিয়া দিতে চলিল, আমার সাধের সংসার-খেলা ভাঙ্গিবার সূচনা করিল।

অবিলম্বে আমরা একটী ছোট বাড়ীর ছোট বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। অনাড়ম্বর ঘরখানিতে একখানি ছোট চৌকির উপর ও নীচে মেজের উপর দুইখানি কম্বল পাত। পাশাপাশি উভয়ে চৌকির উপর আসন গ্রহণ করিলে, ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন—"আপনি পাশার ঘুটি চালতে জানেন ত ?" আমি সহাস্যে উত্তর করিলাম, "হাঁ, কিছু কিছু জানি বৈ কি ” ভদ্রলোক বলিলেন "মহাশয়, পাশা খেলা ভারি শক্ত দান পড়াও চাই আবার চাল্ জানাও দরকার ঠিক যেন দৈব আর পুরুষকার দেখুন না, দান পড়ে ভাগ্যে অর্থাৎ দৈবে আর চাল দিতে চাই বুদ্ধির কৌশল অর্থাৎ পুরুষকার। কারুর হয়ত দান পড়ে ভাল, কিন্তু চাল জানে না, অপরে হয়ত চাল জানে ভাল, কিন্তু দান পড়ে না —তারা উভয়ে ঠকে যায় এই দেখুন—ভাগ্যবশে অনায়াসে অনেকে সুন্দর সুদৃশ্য পায়, পাঞ্জা

পাশা খেলায় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

পায়, পারিপার্শ্বিক সহায় ও সৎসঙ্গ পায় কিন্তু সে সব জিনিষের সদ্ব্যবহার ক'রে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হ'তে পারে না। তারা অধ্যবসায় দ্বারা কর্ম্মের 'কেন্দ্রযোগ' অবলম্বন করে না। আনাড়ি খেলোয়াড়রাও তেমনি ভাগ্যবশে প্রাপ্ত বড় বড় দানগুলির অপব্যবহার করে। ঘুঁটিগুলি তাদের বেঘোরে মারা পড়ে—বাজী হার হয়। অপর এক দল আছেন যাঁদের খুব চাল্ জানা আছে অর্থাৎ খুব বড় বড় জ্ঞানী, যোগী, কর্ম্মী ইত্যাদি; কিন্তু হবে কি দৈবের দান তাঁদের পক্ষে বিরূপ (সহাস্যে) তোমার দান পড়ে ভাল কিন্তু চাল্ তেমন জানা নেই।

ধর্ম্মমত জিজ্ঞাসা, ভদ্রলোকটির অদ্ভুত ভাব ও আমার ভুল সংশোধন।

অবাক হইয়া পাশা খেলার এই আধ্যাত্মিক বিবরণ শুনিতেছিলাম, এমন সময়ে গৃহাভ্যন্তর হইতে জনৈক ভদ্রলোকের আবির্ভাবে বক্তার মন সেইদিকে আকর্ষিত হইল; তিনি সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন—"ওগো! ডাক্তার, এই বাবুটী পাশা খেলতে জানেন পাশা নিয়ে এস, আর একজন কাউকে ডাক।" সসম্ভ্রমে চশমাধারী ডাক্তারটী আদেশ প্রতিপালনার্থে বহির্গত হইলেন কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ভদ্রলোকটী আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ধর্ম্ম সম্বন্ধে আপনার মতামত কি? আলোচনা ক'রে থাকেন ত? বর্ত্তমান যুগস্রোতে আপনার আস্থাই বা কিরূপ?" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ভদ্রলোক আবার নিজের অভিমত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন—"মাথা মুণ্ড আলোচনাই বা কি করবে! বিশ্বের মতামতের নিষ্পেষণে পড়ে ধর্ম্মটি ভারি তালগোল পাকিয়ে গেছে, অতি নিকটের জিনিষ দূরে সরা দিয়েছে সংশয় দূর করতে গিয়ে অনন্ত সমস্যা এসে হাজির হয়েছে! যখন কোন একটী ধর্ম্ম-পিপাসাতুর জিজ্ঞাসুর দিকে তাকাই তখন চোখ ফেটে জল বেরোয়! কোন একটী পন্থার উপদেশ প্রদান করতে গেলে নানা সম্প্রদায়ের বিরোধী

আলোড়নে তাদের মাথা গুলিয়ে যায়। ভাব দেখে মনে হয়, পথের ভাল মন্দ বাছতে বাছতে এদের হয়ত কত জন্ম কেটে যাবে, তারপর ভাগ্যে যদি পথের নির্দ্দেশ পায় তবে এগোবে—সে অনেক দেরের কথা।

কথা শুনিয়া আমার একটী প্রশ্ন জাগিয়াছিল। ভাবিলাম, জিজ্ঞাসা করি—মানুষের ব্যক্তিত্বের কি কোন সাধারণ শক্তি নাই, যাহা দিয়া অনুশীলন করিতে করিতে মানুষ প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে? তবে আমরা "বিবেক" বলিয়া যে শব্দটী ব্যবহার করি তাহার সার্থকতা কি? ছাটিয় কাটিয়া প্রশ্নটী আঁচিয়া যখন মুখপানে তাকাইলাম অমনি এক বিস্ময়কর দৃশ্যে সব ভুল হইয়া গেল। দেখিলাম ভদ্রলোকের বদন ও নয়ন যেন জবার মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। অধরোষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইতেছে আর নয়ন দুইটী দিয়া অবিরল ধারা প্রবাহিত হইতেছে। প্রথমে কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া অবাক হইয়াছিলাম কিন্তু অবিলম্বেই বুঝিলাম ইহা আর কিছু নয়, নিখিল জীবকল্যাণের মহতী চিন্তায় এই মহাপ্রাণ অনুপ্রাণিত। অপরূপ পবিত্র দৃশ্য বটে; এমনটী ত পূর্ব্বে কখন দেখি নাই! একজন কীর্ত্তনীয়ার আখরে শুনিয়াছিলাম—

'জীবের দশা মলিন দেখে
কার বা অমন হৃদয় কাঁদে
দয়াল নিতাই তোমার মতন"—

প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসর হইতে চলিল কবিগণের ভাষার ভিতর দিয়া যে দেবতার পবিত্র ছবি জন সাধরণের মানস পটে কল্পনায় তুলিতে অঙ্কিত, আজ বুঝি আমি সেই বিশ্ব প্রেমিক দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিলাম। এ যাবৎ কেতাবেই শুনিয়া আসিতেছি; কই, মূর্ত্তিমান এত লোক-প্রেম কাহারও ভিতর অন্ততঃ আমি ত দেখি নাই। আমার সাজান গুছান

প্রাণটা জুড়াইয়া গেল, পুলকে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল কিছুক্ষণের জন্য সম্মুখে যেন নূতন এক জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল। সে জগতে শুধু পবিত্রতা, শুধু ভালবাসা—সে ভালবাসা স্বার্থগন্ধ শূন্য, শুধু পরের ভাল মন্দের প্রাণ পাইয়াছে

এইরূপ ভাব-বিহ্বল অবস্থায় উভয়ে অবস্থান করিতেছি, এমন সময় ডাক্তার বাবু ও নবাগত একটী ভদ্র লোকের গৃহ প্রবেশ শব্দে আমাদের সেই ভাবরাজ্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিল সামলাইয়া লইয়া উভয়ে নয়ন ফিরাইলে, নবাগত ভদ্রলোকটী এই অদ্ভুত পুরুষটীর চরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করিলেন সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়েও একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল মনে হইল, দেখিতেছি ইনি ভক্তির পাত্র প্রণম্য, কিন্তু কই আমি ত ভক্তি ব্যঞ্জক কোন ব্যবহার প্রকাশ করি নাই গতানুশোচনার পক্ষপাতী ছিলাম না বলিয়া মনটাকে টপ্ করিয়া ঝাড়িয়া লইতে সক্ষম হইলাম ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আর বর্ত্তমান দোষ সংশোধনের জন্য দুই হস্তে পা দুখানি আঁকড়াইয়া ধরিয়া মস্তক সংলগ্ন করিলাম আঃ কি তৃপ্তি! প্রাণ যেন অভূতপূর্ব্ব রসে আপ্লুত হইল—জুড়াইয়া গেল। ওগো, তখনও বুঝিতে পারি নাই যে আজিকার এই শুভ মুহূর্ত্তের লুণ্ঠিত মস্তক চিরদিনের জন্য ঐ পাদ-পদ্মে আবদ্ধ হইল—আর উঠিবে না। অহং এর সকল গর্ব্ব আজ এইখানেই শেষ।

"কি, দেখা দেখি নাকি?" অদ্ভুত পুরুষটী সহাস্যে এই কথা বলিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইলেন আমি ও অপ্রতিভভাবে স্বাভাবিক সহজ স্বরে ছোট কথায় একটী—"হাঁ" দিলাম গম্ভীর হইয়া তিনি বলিলেন—"হ'লই বা, দোষ কি! স্বয়ং শিক্ষিত কাউকে কোথাও দেখেছ কি? দেখার কথা দূরে থাক, শোনাও যায় না। কোন কেতাবেও নেই। পারিপার্শ্বিক

পাশাখেলায় অদ্ভুত বাজী

অবস্থা ভেদে দেখিয়া শুনিয়া সন্দেহ দ্বারাই সকলের য কিছু শিক্ষা—অন্যথায় অসম্ভব।"

পাশা আসিয়াছে, চতুর্থ খেড়ুটিও উপস্থিত। তখন চারিজনে নিম্ন স্থিত কম্বলাসনের চারিটী কোণ অধিকার করিয়া বসিলাম পাশা পাতা হইল। ঘুঁটিগুলিও নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয় শোভা পাইতে লাগিল। নবাগত ভদ্রলোক পূর্ব্ব হইতেই আমার ঈপ্সিত স্থান অধিকার করায় বাধ্য হইয়া আমাকে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে বসিতে হইল। অদ্ভুত পুরুষটী মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন—"ও ভালই হয়েছে, মনে করনা সেই জয় বিজয়ের ব্যাপার; শত্রুভাবে তারা তিন জন্মেই পেয়েছিল, নইলে মিত্রভাবে সাতটা সাতটা জন্ম তাদের ভুগতে হ'ত। নাও—বুক ঠুকে লেগে যাও; জিতলেও যা, হারলেও তাই। (সহাস্যে) কিন্তু একট কথা আছে, বাজী রেখে খেলতে হবে ওহে বাবু! কি বাজী রাখবে বল?" নবাগত ভদ্রলোকটি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন "সন্দেশ! সন্দেশ!! সন্দেশ বাজী হ'ক।" উত্থাপন কর্ত্তা বলিলেন—"তা হয় না তোমাদের বাপু পয়সা আছে, আমার যে ও দফায় গোলাকার পড়েছে। (আমার দিকে তাকাইয়া) তুমি বোধ হয় অবাক হয়ে যাচ্ছ? আমি ঠিক কথাই বলেছি, বাস্তবিক আমার কিছু নেই—একেবারে ফকির। (স্বীয় দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এই যা দেখতে পাচ্ছ, এই শুধু খোলসটা, আর এর মধ্যে এই যে একটা আমি আমি কচ্ছে তা এটাও সব সময় থাকে না, যা হ'ক—এই আছে আমার বাজী দেহ সমেত আমিটা। দেখ, রাজী আছ? আমার সাথে খেলতে হ'লে তোমারও ঐ রকম বাজী রাখতে হবে। যে হারবে সে অপরের নিকট চিরকাল বিক্রীত। বিবেচনা করে দেখ, (অভিনয়ের সুরে) থাকে যদি শক্তি তব হও অগ্রসর (উচ্চ হাস্য)। আবার

বলিতে লাগিলেন—"পাশা না ত, পাওয়ার আশা। কি পাওয়া জান? ঘর পাওয়া; যেখানে উঠলে আব পতনের সম্ভাবনা থাকে না পার্শ্বেই কিন্তু আর একটা বিরোধী দল দাঁড়িয়ে আছে, সেও ঘরে উঠতে চায়। এই যেমন একই হৃদয়কে অধিকাব করতে ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো দল কোমর বেঁধে দাঁড়ায়। এক একটা জনম যেন এক একটা বাজী ঘরে উঠতে গিয়ে দুই দলে অনেক মারামারি হয়। অনেক বার পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দিয়ে আবার গোড়া থেকে বুক লাগাতে হয়। স্বীয় হৃদয়কে অধিকার করাই মুক্তি, অন্য কিছু না মানলেও চলতে পারে।" মৃদুস্বরে ডাক্তার বাবু বলিলেন—"এথানে কিন্তু স্বতন্ত্র কথা আপনিত বলে এলেন হারলেও য, জিতলেও তাই অর্থাৎ দুটোতেই জিত।" ডাক্তার বাবুর কথায় মনোযোগ না দিয়া আমাকে বলিলেন—"কি বল? দেরী হচ্চে, বাজী স্বীকার ত? তুমি হারলে আমাব হবে, আমি হারলে তোমার হব—চিরদিনের জন্য।

কি উত্তর দিব, মাথায় কিছু আসিতেছিল না। এই অদ্ভুত লোকটার সহিত অদ্ভুত পাশা খেলার অদ্ভুত বাজী! এমন রহস্যময় পাশা খেলা বোধ হয় পূর্ব্বে কথন হয় নাই পৌরাণিক নল, যুধিষ্ঠিরাদি পাশা খেলায় সর্ব্বস্বান্ত হইলেও স্বীয় দেহ-মনের উপরে তাঁহাদের স্বাধীনতা ছিল খেলার ছলে হইলেও আজ আমাদের মধ্যে কি ভয়ানক বাজীর প্রস্তাব হইতেছে, যাহাই হউক আমার ইহাতে সঙ্কোচের ত কিছুই দেখিতেছি না আজ যদি ইহা রহস্যের কথা বা মুখের কথা না হইয়া কার্য্যতঃ হয়, তাহাতেও ভয় পাইবার কিছুই নাই। একটা নূতন কীর্ত্তি ত? আবার কথাটী বেশ প্রাণের কথা, "নিজের বলিতে কিছুই থাকিবে না, হয় আমি তোমার হব, না হয় তুমি আমার হবে।" এমনি একটী লাভ লোকসানের বাণিজ্য, হাব জিতের প্রতিযোগিতার অপেক্ষায় প্রাণ

অনেকদিন হইতে উন্মুখী রহিয়াছে। হয়ত আজ আমার সেই শুভ মুহূর্ত উপস্থিত যাহা হইবার হইয়া যাক। প্রাণ বিস্ময়াকুল হইলেও বুঝিতে ছিলাম যে ক্রমে যেন এক আনন্দ রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি এইরূপ চিন্তা করিবার পর প্রকাশ্যে বলিলাম—"আমি আনন্দের সহিত এই বাজী স্বীকার করে নিচ্ছি রহস্য বা ছলক্রমে নয়, সত্য সত্যই আমি বলছি, আজ যদি পাশা খেলায় হেরে যাই তা হ'লে চিরদিনের জন্য আপনার হয়ে যাব তাতে আমার বাহ্যতঃ লোকসান হ'লেও লাভের পরিমাণ ষোল আনা আমার মত প্রাণের অবস্থা না হ'লে কেউ সে লাভের কথা বুঝতে পারবে না। আর আপনি যদি হেরে যান তা হ'লে আপনি আমার হতে পারেন বটে কিন্তু সে কথাটা ভেবে তত আনন্দ পাচ্ছিনা চিন্তার কারণ এই যে আপনাকে নিয়ে করব কি? অত ঝঞ্ঝাট আমার পোষাবে না। আশীর্ব্বাদ করুন, আজ আমি হেরে গিয়ে যেন চিরদিনের জন্য আপনার হয়ে যেতে পারি। নেওয়ার চেয়ে দেওয়া ভাল কর্ত্তার চেয়ে দাসের জীবনে শান্তি আছে, ( সকলের হাস্য )।"

পাশা খেলা ও আত্মসমর্পণ।

খেলা আরম্ভ হইল। হারিবার ইচ্ছা মুখে প্রকাশ করিলেও ব্যবহার ক্ষেত্রে অন্যরূপ দাঁড়াইল প্রাণপণে নিজেকে সামলাইতে থাকিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে জিতিবার আশা করিতে লাগিলাম, ঐ কথায় বলেনা—"স্বভাব না যায় মলে—।" এখানেও ঠিক তাহাই ঘটিল সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখা যায় অনেকে ভগবানকে সার সর্ব্বস্ব ভাবিয়া তাঁহার পায়ে আত্ম সমর্পণ করিয়াও নিজের অহংএর কর্তৃত্ব একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন না অবশ্য তাহাও বোধ হয় ভগবানের অভিপ্রায়, নচেৎ তাঁহার লীলার সার্থকতা থাকে না। আমার পাশা খেলার মধ্যেও সেইরূপ একটা রহস্য নিহিত ছিল—

পরে তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অনেক চেষ্টা করিবার পরও জয়লাভ করা ভাগ্যে ঘটিল না। অব্যর্থ গতিতে সেই অদ্ভুত পুরুষটী তাঁহার দুই হাত ঘরে তুলিলেন। আর আমার দুইটী হাতই বাহিরে পড়িয়া রহিল সকলের উচ্চ হাসিতে ঘরখানি মুখরিত হইয়া উঠিল আমিও দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া সেই হাসির ভাণ্ডারে কিছু দান করিতে পারিয়াছিলাম আবার বাজী আরম্ভ হইল অনেক যুঝিলাম, কিন্তু ভাগ্য একেবারে বিরূপ। জয়লক্ষ্মী আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। হাসিতে হাসিতে সকলে আবার দৃঢ় হইয়া বসিলেন; আমার কিন্তু এই তৃতীয়বার আর আশা ছিলনা। এমনি করিয়া পর পর তিন বাজী হারিবার পর সন্ধ্যা হইয়া আসিল—খেলাও শেষ হইল অদ্ভুত পুরুষট হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"কেমন হে বাবু, এইবার তুমি আমার কিন ? যদি তুমি সত্যের আইন মান, তা হ'লে আজ হ'তে তুমি ছেলের নও, স্ত্রীর নও, পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব কাহারও নও, তুমি আমার তুমি প্রাণ ভরে এইবার বল (গানের সুরে) শুধু আজ নয়, কাল নয়, দুদিনের তরে নয়, চিরদিন আমি তোমার। শুনাবে ভাল, হয়ত একদিন বিশ্বের ইতিহাসে তোমার এই পাশা খেলার কীর্ত্তি উঠে যেতে পারে, তখন সকলেই শুনবে ভাল।" আবার সেই মর্ম্মভেদি হাসি অবনত মস্তকে স্বীকার করিলাম—"হাঁ, আমি আপনার "

হাঁ, মানুষের মত মানুষ বটে, ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিলাম।

৩

## স্বামীজীর ডাক।

রাত্রে বিছানায় পড়িয়া বহুক্ষণ ছট্‌ফট করিতে হইল, নিদ্রা আসিল না। ভাদ্র মাসের গঙ্গার ন্যায় প্রবল চিন্তা-স্রোত উত্তাল তরঙ্গে প্রবাহিত হইল। কত কি কল্পনায় রাজ্য ভাঙ্গিলাম, গড়িলাম তাহার ইয়ত্তা নাই! অনেকদিন পরে আজ যেন প্রাণ নূতন করিয়া ভগবানকে পাইবার আশায় জাগিয়া উঠিয়াছে প্রাণকে যেন সমস্ত জগতের অন্তরালে টানিয়া লইয়া এক অপ্রাকৃত রস আস্বাদানে উন্মুখী করিয়া তুলিয়াছে আরও ভাবিতেছিলাম, লোকটীর আশ্চর্য্য প্রভাব; যেমন এক মুহূর্ত্তে আমার হৃদয়টুকু অধিকার করিয়া ফেলিল ইহাও ভাবিতেছি বিদেশে অমন অপরিচিতের সহিত হঠাৎ অতটা প্রাণ খোলা মেশামিশি করা বোধ হয় ভাল হয় নাই। কখন পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, ভাবিয়া নিজেকে ব্যাকুব ঠাওরাইতেছিলাম কিন্তু কই অপরিচিতের মত কোন সঙ্কোচ ত আসিল না। যাহা হউক কাল প্রভাতে পরিচয়টা জানিয়া লইতে হইবে। আবার কখন সহায়হীন স্থানে এমন একজন প্রাণের বন্ধু পাওয়া গেল মনে ভাবিয়া ভাগ্যজ্ঞান করিতেছিলাম। এমনি বহুপ্রকারের অসম্বন্ধ চিন্তা করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি তাহা ঠিক বলিতে পারিব না। যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা প্রায় আটটা বাজিবার উপক্রম।

অদ্ভুত পুরুষটী সম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তা

গবাক্ষ দ্বার খোলা ছিল; মুখের উপর সূর্য্যের খুব কড়া উত্তাপের

অনুভূতিতে বেলা বেশী হইয়াছে অনুমান হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম চোখ মুছিতে মুছিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া সঙ্গীটীর মুখে সংবাদ পাইলাম ইতিপূর্ব্বে স্বামীজী আসিয়াছিলেন। বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—"স্বামীজী কি বাসাতেই আসিয়াছিলেন? তিনি কি বলিলেন? তাঁহাকে দেখিতেই বা কিরূপ? সঙ্গে অন্য কেহ ছিল কি না?" উত্তরে সে বলিল তিনি বাসায় আসেন নাই, একজন ভদ্রলোককে পাঠাইয়া রাস্তায় অপেক্ষা করিতেছিলেন স্বামীজীকে আমি দেখি নাই ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন,—"সীতানাথ বাবু কোথায়? স্বামীজী তাঁকে ডেকেছেন" আরও প্রশ্ন করিয়া জানিলাম সে তাঁহার বাসার সংবাদ লয় নাই. প্রাণের মাঝে তুমুল ঝড় উপস্থিত হইল ইনিই কি সেই স্বামীজী, যাঁহাতে মহাপুরুষত্বের আরোপ করিয়া অনেক দিন হইতে যাঁহার ডাকের অপেক্ষা করিতেছি? সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তবে তিনি আমার প্রাণের গোপন কাহিনী অবগত হইয়াছেন, না ডাকিলে যাইবনা জানিয়া মহাপুরুষ আজ দুয়ারে আসিয়া ডাকিয়া গিয়াছেন ইহা অপেক্ষা দয়ার কথা আর কি হইতে পারে? যে সন্দেহে চিত্ত দোদুল্যমান ছিল, যে পরীক্ষার প্রশ্ন দিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার মনস্থ করিয়াছিলাম, সেই প্রাণের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়া আজ আমার সন্দেহ ত ভঞ্জন করিয়াছেন? প্রাণের কষ্টি পাথরে খাঁটি মহাপুরুষের উজ্জ্বল দাগ পড়িয়াছে, তবে আর কেন! এইবার মহাপুরুষের পাদপদ্মে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া জীবন ধন্য করি—মানব জনম সফল করি। ভাবিতে ভাবিতে কার্য্যান্তরে চিত্ত নিয়োগ করিলাম

স্বামীজীর ডাক, তিনিই মহাপুরুষ

মধ্যাহ্নে ভোজন ক্রিয়া সমাপনান্তে বিছানায় পড়িয়া একখানি

পুস্তকের পাতা উল্টাইতে ছিলাম। পুস্তকখানিতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি মতামত নিবদ্ধ ছিল। পড়িতে পড়িতে গতদিবসের কথা মনে পড়িল। 'ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত কি?" এই প্রশ্নটী বিশেষ ভাবে জাগরূক হইল। ভাবিতে ভাবিতে বায়োস্কোপের মত পূর্ব্ব দিবসের ঘটনাগুলি পুনরাবৃত্ত হইতেছিল, আর সেই অদ্ভুত পুরুষটীর মূর্ত্তিখানি আমার চোখের সম্মুখে যেন স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছিলাম সেই হাসি হাসি মুখখানি, সেই প্রেম মাখান অন্তর ভেদি সুমধুর দৃষ্টি; আহা! চল চল মুখখানি যেন কত সোহাগের কথা বলিবার জন্যই উদ্যোগী হইয়া রহিয়াছে ক্রমে ক্রমে আমার সেই কল্পনা এত গভীর ও জমাট হইয়া আসিল যে মূর্ত্তিখানিকে কাল্পনিক বলিয়া জ্ঞান রহিল না। দেখিতেছি যেন দেওয়ালের গাত্র হইতে অদ্ভুত পুরুষটী নামিয়া আমার শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, কি যেন বলিবেন এইরূপ চেষ্টা দেখিয়া যখন আমি বলিতে বলিবার উপক্রম করিয়াছি, অমনি কাহার পদ শব্দ শ্রুতি গোচর হইল। মন সেই শব্দে নাড়িয়া যাওয়ায় আমার আনন্দ রাজ্যের—বড় সাধের কল্পিত মূর্ত্তিখানি ভাঙ্গিয়া গেল, বুকখানি যেন ভীষন আঘাতে ধড় ফড় করিতে লাগিল। কল্পনা হইলেও আমি আজ যে আনন্দের সমুদ্রে ভাসিয়াছিলাম, চিন্তার মধ্য দিয়া জীবনে এমন আনন্দ কোনদিন পাই নাই অনিচ্ছাসত্ত্বে চক্ষু ফিরাইয়া কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহাতে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। এইমাত্র যাঁহাকে চিন্তাযোগে দেখিতেছিলাম, মূর্ত্ত তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এক অভূতপূর্ব্ব আলোড়ন উপস্থিত হইয়া সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। ভাব-গদগদ চিত্তে—সসম্ভ্রমে বিছানা হইতে উঠিয়া আমার প্রভুকে অভ্যর্থনা করিলাম। আসন গ্রহণ করিয়াই

আমার বাসায় অদ্ভুত পুরুষটীর আগমন।

তিনি আমাকে বলিলেন -"মনে আছে ত বাবু, তোমাকে আর নিজের কোন অধিকার নেই ; এমন কি—খাওয়া শোওয়া, চলা ফেরা, দেহরক্ষা ইত্যাদি। কোন কর্ত্তব্য তোমার নিজের কাছে নেই, বুঝেছ ত ?" সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশ্বমোহিনী হাস্যলহরী। আমি নম্রভাবে বলিলাম, "হা প্রভু! মনে আছে।" তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখের উপর কটাক্ষপাত করিয়া প্রভু বলিলেন —"ভাল, মনে আছে ত কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করে নিচ্ছ না কেন ? যার আত্মবিক্রয় হয়ে গেছে, তার কি আর স্বাধীনভাবে চলা সাজে ? সেটা ব্যভিচার বলে প্রতিপন্ন হবে (গম্ভীর ভাবে অভিনয়ের সুরে) সাবধান ওরে ক্রীতদাস. ধন্য তোর সাহস, কেমনে তুই আহার নিদ্রা করিলি আপন—বিনা মোর আদেশ ক্রমে ? (উচ্চ হাস্য) আমিও আর থাকিতে পারিলাম না, অভিনয়ের সুরে বিনীতভাবে বলিলাম, "করেছি বড় অপরাধ, ক্ষমা কর প্রভু মোরে।"

সঙ্গে দুইটী যুবক আসিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কটী ছিল কলেজের ছাত্র শয্যোপস্থিত পুস্তকখানা লইয়া পাতা উল্টাইতে যেখানে সাম্প্রদায়িক মতামত সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা ছিল সেই স্থানটী বাহির করিয়া ফেলিল। বাছিয়া বাছিয়া যুবক এমন একটী কথা পাড়িয়া ফেলিল যেটী পূর্ব্বে আমিই আঁচিয়া রাখিয়াছিলাম। যুবকের মুখ হইতে কথাটী কাড়িয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সেইদিন যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন সেইটী আজ বুঝাইয়া দিন প্রভু বলিলেন—"ভাল কথাই জিজ্ঞাসা করেছ। পৃথিবীর মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক মত প্রচলিত বিশেষতঃ আমাদের এই হিন্দুধর্ম্ম আমার ধারণায় বিরোধ শূন্য ধর্ম্ম মতটাই প্রকৃত পক্ষে মত। যত মত, যত পথই থাক্ না যে মতে অপরের প্রতি কটাক্ষপাত করতে দেখা যায় না সেইটীই

সম্প্রদায়িক মতামত।

সমন্বয় ধর্ম্মের কথা।

উপাদেয় বলে বোধ হয় ধর্ম্মের মধ্যে হিংসা দ্বেষের চিহ্ন বড়ই বীভৎসাকার ধারণ করে আমরা সাংসারিক প্রবৃত্তির উৎকট সংস্কারটা ধর্ম্মরাজ্যে প্রয়োগ করে যে নিতান্ত ভুল করে ফেলি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মসংস্কারকদিগের সকলের আগে এই বড় ভুলটার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে—তারপর সাধন ভজনের উপদেশ। ধর্ম্ম মতের লড়াই নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে যে কত অত্যাচার অনাচার সংঘটন হয়েছে তা নির্ণয় করা কঠিন সমন্বয় বা সাম্য মতের প্রতিষ্ঠা না হ'লে কখন এই সমস্যার মীমাংসা হবে না। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের প্রচার কল্পে অনেক মহাত্মারা সমন্বয়বাদে অনুপ্রাণিত হয়েছেন সত্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানেও সাংসারিক দ্বন্দ্বের প্রভাব দেখা যায়। যাঁরা সমন্বয়ের বিশেষ গোঁড়া, তাঁরাই আবার সকল ধর্ম্মের গোঁড়ামীর উপর কটাক্ষ পাত করেন নিজেদের মস্ত একটা মত বিশিষ্ট গোঁড়ামীর গণ্ডিতে আবদ্ধ হন। তাই বলছি, সমন্বয় শব্দটাও মানুষকে মস্ত একটা ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। দেখে শুনে অনেকেরই মনে সন্দেহ আসে—প্রকৃত সমন্বয় হয় কি না।

**প্রকৃত সমন্বয় কাহাকে বলে**

আমার মনে হয় সমন্বয় কখন গঠনমূলক না হ'য়ে ধ্বংস মূলক হ'তে পারে না। সমন্বয়ে বিরোধ সৃষ্টির কল্পনা করাও গঠন কার্য্যে বিফলতার সূচনা। আমরা সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়ে প্রথমেই যে কোন মত বিশেষের বিরোধে তর্ক উত্থাপন করি, এই দুর্ব্বলতা সর্ব্বপ্রথমে বর্জ্জনীয়। দেখ, যদি উদারনীতি অবলম্বন করে আমরা অনুসন্ধান করি তা হলে দেখতে পাব, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের চরমাদর্শের সহিত একটা সত্যের সম্বন্ধ আছে। দার্শনিকদিগের কূট-যুক্তি-তর্কের খোসা বাদ দিয়ে শুধু উদ্দেশ্য ধরে বিচার করলে দেখতে পাব, প্রত্যেকটীতেই সেই সেই সত্যাদর্শ প্রাপ্তির উপায় ত আছেই পরন্তু পথটা দিয়ে তাকা'লে উহা পরিষ্কার নির্ভুল ব'লে

বিশ্বাস হবে আদর্শের এই যে তারতম্য দৃষ্ট হয় সেটাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না ; কেননা সকল আদর্শেরই শেষ প্রান্তে একটা অনির্ব্বচনীয় মহানাদর্শের কথা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয়, ইহা দার্শনিক যুক্তিবাজ পণ্ডিত-দিগেরও স্বীকার্য্য ফলতঃ সেই মহান আদর্শটাকে বাদ দিলে সকল সম্প্রদায়ই দোষযুক্ত হইয়া পড়ে—কিছু না কিছু অপূর্ণতা দেখা যায় তাই ধরে পরস্পর মারামারি নিরপেক্ষ উদার দৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিতেরা দেখতে পান যিনি অপর পক্ষকে দাবাইয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তি তর্কের বিপুল আয়োজন করেছেন তাঁদের মধ্যেও মস্ত বড় একটা অপূর্ণতাস্বরূপ ছিদ্র আছে বোধহয় এই কারণেই আজ পর্য্যন্ত জগতে কোন একটা মত বিশেষের একাধিপত্য হয়নি আজ যিনি গত মহাপুরুষগণ প্রবর্ত্তিত সকলের মতগুলি খণ্ডন করে স্বীয় মত স্থাপন ক'রলেন, কাল আবার তাঁরই যুক্তি-তর্কের প্রাচীর বদ্ধ মতটাকে আর একজন এসে চুর্ণীকৃত করে ফেল্লেন। স্ব স্ব মত প্রচারকালে কেহই খাট নহেন। তাই বড় দুঃখে বেদান্ত বলেছেন তর্কের সম্যক প্রতিষ্ঠা নেই। আমাদের দেশের বড় বড় দার্শনিক শঙ্কর প্রমুখ মহাত্মারা, ওদেশেরও ক্যাণ্ট, স্পেন্সার প্রভৃতি মনীষীবৃন্দও সে কথার প্রতিধ্বনি করেছেন এইরূপ মতামতের সংঘর্ষে জগতে যে কিছু কাজ হয়নি, সে কথা বলে কোন ব্যক্তি বিশেষের মনে আমি কষ্ট দিতে চাইনে। কিন্তু তাতে কুফলও যে ফলেছে সেটাও ত তাঁরা স্বীকার করে থাকেন। প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকিলে জ্ঞান-চর্চ্চার উৎকর্ষ সাধিত হয় না। তাই বলিয়া আধ্যাত্মিক পথে মতামতের একান্ত প্রয়োজন এ কথা স্বীকার করা যায় না। বিদ্বেষ দ্বারা সঞ্চিত জ্ঞান কখন পবিত্র হতে পারে না, সুতরাং সে জ্ঞানের দ্বারা পরম পবিত্রের কাছে পৌছান অসম্ভব। এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের আক্রমণ হতে উদ্ধার

মতামত সংঘর্ষের ফলাফল

পাওয়ার জন্য, অথবা অপরকে আক্রমণের জন্য ছিদ্র অন্বেষণ করে' মাথা ঘামিয়ে যে সব বড় বড় তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, সেগুলির উপকারিতা স্বীকার করতে শঙ্কা উপস্থিত হয় "বিরোধেই সৃষ্টি, সাম্যে প্রলয়' এই দার্শনিক সিদ্ধান্তও আমি অগ্রাহ্য করিতে পারিনে; তবে মনে হয় সমাজের মাথায় যেটা লয়ের অবস্থা দৃষ্ট হয় সেইটাই অমর সৃষ্টি এ সম্বন্ধে বিস্তার করিতে গেলে, অনেক কথা উঠবে এবং আমাকেই বোধ হয় সেই অনাস্থিত যুক্তি তর্কবাজ দার্শনিকের কোঠায় গিয়ে পড়তে হবে তাই সংক্ষেপে একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করি দেখ, সুখ শান্তি দুটোই যাতে মেলে সেইটিই পথ। বিরোধের ভিতর দিয়ে যে গঠন (যদি কেহ সংস্কার বশতঃ বিরোধমূলক গঠনের সত্যতা স্বীকার করেন) সেটা দুঃখ ও বিপদ সঙ্কুল; আর সাম্যের ভিতর দিয়ে হবে সহজ—স্বচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠা ওগো বিনা লড়াইয়ে রাজ্য ভোগ করবার সুবিধা থাকলে কে বাপু, লড়াই করতে ছোটে? বলতে পার "স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যের উপর শক্তি প্রয়োগ না করতে পারি কিন্তু বিনা প্রতিরোধে বিরোধ-নীতিমূলক ব্যক্তিদের হাত থেকে অব্যাহতির উপায় কি? তাদের প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ব্বিরোধ সমন্বয় পন্থার সত্ত্ব বিলোপ হওয়াই স্বাভাবিক।" আমার মনে হয়—তা হ'তে পারে না অহিংস সাম্য নীতির সম্মুখে যে কোন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির হৃদয় শীতল হবে। এই সাম্যতাই যে ধর্ম্মের প্রাণ

সমন্বয় ধর্ম্মে নীরব প্রচার।

পূর্ব্বে আমি সমন্বয়কে গঠন মূলক বলে এসেছি। তবে গঠন বলতে নূতন কিছু সৃষ্টি বুঝাইবেনা, পুরাতনের শৃঙ্খলতা মাত্র। গঠনের মধ্যে ঝাড়া, মোছা ও পচা অংশ বাদ দেওয়া প্রভৃতির ভিতর দিয়ে যে কার্য্য হয় সেটাকে ধর্ম্মের সংস্কার করা বলে। এই সংস্কারের মধ্যে কোন

বিরোধের আপত্তি উঠতে পারে না; কেননা পারিপাট্যের পক্ষপাতী কে নয়? একান্ত যদি আপত্তি উঠে তবে ঐ সংস্কার মূলক গঠনও পরিহর্ত্তব্য যা আছে তাই থাক্ পরিবর্ত্তনের জন্য অপরের ভাব-স্রোতে বাধা না দিয়ে, তুমি তোমার অংশ সংশোধন করে দেবে, অথচ সকলের সাথেই মিশবে, আনন্দ করবে তোমার উদার ব্যবহার দ্বারাই সমন্বয়ের প্রচার হবে অপরের ব্যবহারে কটাক্ষপাত করে কাজ হবে না। প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ কতকগুলি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি প্রবেশ ক'রে যদি দল বাঁধবার চেষ্টা না রেখে উদার ভাবে কাজ করে যায়, তা হলে বোধ হয় সমন্বয় ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব প্রধান কথা হচ্চে, আত্মপ্রতিষ্ঠা বাদ না দিলে সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা চলে না প্রকারান্তরে এই সমন্বয় জিনিষটা মস্ত একটা সাধনার জিনিষ হয়ে পড়ে। সিদ্ধি, মুক্তি প্রভৃতি অবস্থা এই সমন্বয়ের মধ্যে খুঁজলেই পাওয়া যায় শৃঙ্খলতা বা প্রচারের জন্য তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না তোমরা একনিষ্ঠভাবে তোমাদের সাধনায় অগ্রসর হও যে কোন একটা সম্প্রদায়ে নাম লিখিয়ে বা না লিখিয়ে সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলে মিশে চল—একেবারে আত্মবৎ মিশতে গেলে তারা যদি তোমায় ঘৃণা করে, প্রতীকারের চেষ্টা করবে না। ব্যবহার যদি প্রিয় হয়, ক'দিন তোমায় দূরে ঠেলবে? সত্যের অমোঘ তেজে, সাম্যের প্রশান্ত মাধুর্য্যে অনতিবিলম্বেই তারা আত্মসমর্পণ করবে আমার মনে হয় সম্প্রদায়গুলির বাইরে চলে গিয়ে নূতন করে একটা সমন্বয়ের দল বাঁধার চেয়ে একটার ভিতর ঢুকে কাজ করলে সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা সহজ ও সুগম হয় বিনা গোলে কাজ হাসিল হয়। আমারও মাঝে মাঝে অন্তরে এমনি একটা ভাবের উদয় হয়, তাতে কোন একটা সম্প্রদায়ের খাতায় নাম লেখাবার প্রেরণা আসে

সম্প্রদায়ের খাতায় নাম লেখাইবার কথা শুনিয়া আমার মধ্যে প্রশ্ন জাগিল, জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হ'লে সম্পূর্ণভাবে তাদের সাম্প্রদায়িক বিধি মেনে চলা উচিত ; অন্যথায় কি সত্যের অপলাপ করা হবেনা ? এক সম্প্রদায়ের আচার অন্য সম্প্রদায়ের নিকট অনাচার সুতরাং অসাম্প্রদায়িক লোকের সাথে মেলা মেশাটা তারা সহ্য করতে পারবে না এমতাবস্থায় নির্ব্বিরোধ থাকা কত দূর সম্ভব ?" অনেক কথা ও উদাহরণ দিয়া প্রশ্নটী আমাদের সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সেই সমুদয় বিস্তার করা অসম্ভব সাম্প্রদায়িক মতামত সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয় আলোচন হইবার পর সঙ্গী দুইটী সহ, প্রভু গাত্রোত্থান করিলেন। এই সমন্বয় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গভীর তত্ত্বোপদেশগুলি আমার হৃদয়ের খুব জমাট একটা পরদা সরাইয়া দিল, সেইদিন হইতে মতামত সম্বন্ধে যত প্রশ্ন উঠিত, সবগুলি আপনা হইতে মীমাংসা হইয়া যাইত সে দিনকার সেই কথাগুলি আমাকে গাঢ় অন্ধকার পথে আলোক দেখাইয়াছে।

আমার বাসার সম্মুখেই ছিল অবিনাশ বাবুর বাসা, পুরীতে আসিয়া তাঁহার বন্ধুত্বে আমি যে বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়াছি সে স্মৃতি বোধহয় জীবনে ভুলিতে পারিব না অবিনাশ বাবু শিক্ষিত, মার্জ্জিত রুচি ও কাব্য প্রিয় ছিলেন। তাঁহার নিকটে বন্ধুত্বের আদর ও আনন্দের শৃঙ্খলতা বিরাজ করিত এক কথায় তাঁহাকে সজ্জন ও ও সদাশয় প্রকৃতির লোক বলিলে অতিরিক্ত বলা হয় না এই সমুদয় গুণ থাকাতে এবং দীর্ঘকাল পুরীবাসী বলিয়া অতি অল্প কালেই তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলাম উভয়ের বাসা এমন সংলগ্ন ব্যবস্থিত ছিল যে এক বাড়ীরই দুইটা অংশ বলিয়া মনে হইত যাহা হউক একাধারে অবিনাশ বাবু আমার প্রতিবেশী, আত্মীয়, সুহৃদ ও সঙ্গী স্বরূপ ছিলেন

পরদিবস আহারান্তে সাবেক অভ্যাস বশতঃ বিছানায় গড়াইতে ছিলাম, এমন সময় অবিনাশ বাবুর আহ্বান বাণী কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি হাঁকিয়া বলিলেন—"চলুন, সীতানাথ বাবু, স্বামীজীর বাসায় বেড়াইতে যাই; তিনি আপনাকে ডেকেছেন।" আবার স্বামীজীর ডাক! বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম স্বামীজীর প্রথম ডাকে হৃদয়ে যে তুফান উঠিয়াছিল, আজ তদপেক্ষাও তরঙ্গায়িত হইয়া ঝটিকালোড়িত মহাসমুদ্রের মত ভীষণাকার ধারণ করিল। তিন দিবস পূর্ব্বে যখন আমার মানবের শ্রীচরণে মাথা নত করি নাই, যখন সেই অদ্ভুত পুরুষ অদ্ভুত আচরণ দ্বারা আমার চিত্তহরণ করেন নাই, তখন স্বামীজীর চিন্তা আমার একটী বিশেষ অবলম্বন হইয়াছিল খেলার ছলে অথবা সত্য করিয়া যাহাই হউক না চিন্তা এখন ভারি একগুঁয়েমি আরম্ভ করিয়াছে। সে সর্ব্বদাই গত তিন দিবসের ঘটনা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে কাল প্রাতে যখন স্বামীজী ডাকিতে আসিয়াছিলেন, জানিয়াও তাঁহার সহিত দেখা করি নাই, তখন বুঝিতে হইবে স্বামীজীর আকর্ষণ প্রায় বিলুপ্ত বাসা জানিতাম না বটে কিন্তু অনুসন্ধান করিলে কি বাসা লুকাইয়া থাকিতে পারিত? তবে কেন সন্ধান লই নাই, ইহা ভাবিবার বিষয়। কতজন্মের ভাগ্য ফলে তবে মহাপুরুষ দর্শন ঘটে—এ জ্ঞান আমার ছিল, উত্তমরূপে পরীক্ষিত সেই মহাপুরুষ আজ আমায় বারংবার আহ্বান করিতেছেন অথচ আমার তাহাতে আগ্রহ নাই। কেন এমন হইল! "মহাপুরুষের পায়ে আত্ম নিবেদন করি" কথাটা ভাবিতে যাইয়া কেমন একটু খিটে বোধ হইতে লাগিল প্রাণের ভিতর যেন বাজিয়া উঠে "ওরে! দেওয়া প্রাণ আবার কাকে দিবি? প্রতিকূলে

আবার স্বামীজীর ডাক। অদ্ভুত পুরুষের সহিত তুলনা প্রভুর জয়

যুক্তি সংগ্রহ করিলাম,—ক্রীড়া কৌতুক ছলে দান করা বস্তু প্রকৃত স্বত্বাধিকারের বাহিরে যায় না। আবার ভাবিতেছি, নিতান্ত যে খেলাই যদি হবে তবে এইরূপ আপত্তিই বা উঠে কেন? বিচার করিলে দেখা যায়, সংসারের যাবতীয় বিধি নিষেধ ত এইরূপ খেলার অন্তর্গত। এই যে হিন্দু ধর্ম্মের মস্ত বড় একটা বন্ধন—বিবাহ, সেটা কি খেলা নয়? স্বামী স্ত্রীর মধ্যে লৌকিক বন্ধনটাই স্বীকার করিতে হয় উহাত সাধারণের অভিসন্ধি মাত্র বৈদিক বিধিকে আমরা যতই না কেন উচ্চে স্থান দিই, ওটা আমাদেরই প্রকৃতিগত ব্যবহারিক শৃঙ্খলতা—সাধারণের নির্দ্দেশ মাত্র প্রাণের সম্বন্ধ আদৌ নাই স্ব স্ব কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তাহারা নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যাকুল কিন্তু এই যে আমাদের খেলার ছলে একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, ইহার মধ্য দিয় যেন একটা অপ্রাকৃত প্রেমের মিলন-সন্ধি দেখা যায় প্রাণের সম্পর্কটাই বেশী; আহা প্রাণ কেমন একের সহিত আজ নিজেকে বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছে কে বলে, ইহা খেলার ছলে ফাঁকা কথা মাত্র? জগতে যদি কোথাও সম্বন্ধের সত্যতা থাকে তাহা বোধ হয় এখানেই আছে। এ প্রাণের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের ক্ষমতা আর কাহারও নাই মহাপুরুষ আসুন অথবা স্বয়ং ভগবান আসুন, অন্য কাহারও নিকট আত্ম সমর্পণ করিতে পারিব না। এ আসনে অন্য কাহারও বসিবার অধিকার নাই। তবে স্বামীজীকে দর্শন করিতে আপত্তি নাই; তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিব যাহাতে প্রভুর পাদপদ্মে আমার গাঢ় অনুরাগ জন্মে এইরূপ স্বীয় কর্ত্তব্যের মতলব আঁটিয়া লইয়া মহাপুরুষ দর্শনে যাত্রা করিলাম।

অবিনাশ বাবু স্বীয় বাটীর সম্মুখে প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

উভয়ে মিলিত হইয়া পথ ধরিলাম চলিতে চলিতে স্বামীজীর ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য অবিনাশবাবুকে দু' একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি স্বীয় স্বভাব সুলভ হাস্যে উত্তর করিলেন,

স্বামীজীর সম্বন্ধে অবিনাশ বাবুর মন্তব্য।

"আপনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে স্বামীজীর সম্বন্ধে প্রশ্ন কল্লেন? এঁ্যা! স্বামী শব্দের অর্থ ভর্ত্তা যাকে সোজা কথায় আমাদের দেশে 'ভ' এ আকার দিয়ে ব্যবহার করে। অবশ্য ভর্ত্তা অপভ্রংশ রোগাক্রান্ত হয়ে মেয়ে মহলে অত পাতল হয়ে গেছেন আমরা সেই মেয়েলি শব্দটা ব্যবহার না করে স্বামীজীই ব্যবহার করি অর্থাৎ আর একটু ভারি হয়ে পড়েছেন, কোন রোগ ঢোকেনি। আপনি আমাকে কুলটা মনে করবেন না। পর পুরুষের কাছে নয়, স্বামী সহবাসে গমন কচ্ছি আর আপনি বল্লেন—"স্বামীজী আমাকে ডেকেছেন, তিনি আমাকে জানলেন কি করে?" এ কথা জিজ্ঞাসা করাও ঠিক হয়নি কেন না, আমাদের স্বামী অসাধু নন, তিনি পর স্ত্রী সম্ভাষণ করেন না। আপনাকে যখন ডেকেছেন তখন নিশ্চয় জানবেন—তাঁর বৈধ ভালবাসার জিনিষ আপনি" উভয়ের হাসির পর্ব্ব শেষ হইয়া গেলে অবিনাশবাবু পুনরায় বলিলেন—"স্বামীজী খুব আমোদ-প্রিয়, সরলান্তঃকরণ তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলে বেশ আনন্দ পাবেন; বেশ উদার প্রকৃতির লোক" কথা বলিতে বলিতে অন্যমনস্ক

ইনিই কি স্বামীজী

হইয়া আমরা অনন্ত শয্যা পশ্চাৎ করিয়াছি, যখন বুঝিতে পারিলাম অবিনাশবাবু আমার মনিবের বাসা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছেন তখন কিছু বিচলিত হইতে হইয়াছিল পরিশেষে অনুমান দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলাম, আমার প্রভু অবিনাশ বাবুর অপরিচিত নহেন বোধ হয় প্রথমে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরে স্বামী সন্দর্শনে যাত্রা করিবেন কিন্তু একি! দ্বার সন্নিধানে

উপস্থিত হইয়া অবিনাশবাবু "স্বামীজী স্বামীজী!" শব্দে ক্ষুদ্র বাসাটী প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন আরও যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের কারণ হইল যখন সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া সহাস্য বদনে আমার প্রভু "আসুন আসুন।" বলে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। আঃ কি পরিতৃপ্তি, হৃদয় ভরপুর হইয়া গেল ভাব যে মানুষকে পরিপূর্ণ শান্তি দিতে সক্ষম, সে কথা সেইদিন সেই শুভ মুহূর্ত্তে আমি অবগত হইয়াছিলাম ভক্তি গদগদ চিত্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেই আমার প্রভু ওরফে স্বামীজী আমার হাত ধরিয়া তুলিলেন। হৃদয় এইবার একেবারে নিঃসন্দেহ হইয়া আর একজনের হইয়া গেল, আর ফিরাইয়া লইতে পারি নাই, পারিবও না।

## ৪

## জ্ঞানের আলো

প্রভুর আজ বেশ ভূষা স্বতন্ত্র। এ যাবৎ কাল তাঁহাকে সাধারণ ভদ্রবেশেই দেখিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আজ দেখিলাম—আড়ম্বর শূন্য সাধু বেশ। আড়ম্বর শূন্য বলিবার কারণ—দীর্ঘ জটাভার, দীর্ঘ শ্মশ্রু, রুদ্রাক্ষ কিম্বা তুলসীর মালা, ত্রিশূল অথবা চিমটি—এই সব কিছু ছিল না বলিয়া প্রভুর পরিধানে ছিল—একখানি গৈরিক বসন, গায়ে ছিল—একটা মোটা গৈরিক চাদর বেশটী বনিয়াছিলও ভাল। যে জিনিষগুলি বাদ দিয়া আমার প্রভুকে আজ সাধু বেশী বলা হইল, সেটা সাধারণের মতের সহিত হয়ত

প্রভু আজ স্বামীজী বেশে

খাপ্ খাইবে না পূর্ব্বোক্ত বাহ্যাড়ম্বর শূন্য হইয়া এ দেশী লোকের নিকট সাধু নামে পরিচিত হওয়া যায় না। আমারও যে সেরূপ ধারণা ছিল না, এমন নহে; তবে প্রথম দর্শনেই কেমন একটা অদ্ভুত পূর্ব্ব প্রণয় সঞ্চার হওয়াতে, একটা পবিত্র আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছিলাম,—প্রাণটা বোধ হয় সেই জন্যই পক্ষপাত গ্রহণ করিয়াছিল। তাই বোধ হয় যে বেশে আজ তাহাকে দেখিলাম সেই বেশটাই সাধু নিদর্শনের উত্তম অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিলাম। প্রভুর এই বেশ পরিবর্ত্তন দেখিয়া ভাবাধিক্য বশতঃ প্রাণের মধ্যে আমার দিব্য কবিতার স্ফূর্ত্তি পাইল। তখন প্রাণ ভরিয়া মনে মনে বলিলাম—

যখন যে বেশে থাক বঁধু হে আমার
সে সাজে সুন্দর কত বলিতে কি পারি অত,
কে'না প্রাণ ফিরে কেন' কত শতবার

এইবার আমি সমস্যার মধ্যে এমন মজার লোকটীকে সাধারণের নিকট কোন্ নামে উল্লেখ করা সঙ্গত? আপনাদের বোধ হয় মনে আছে প্রথমে ইনি ভদ্রলোক, পরে অদ্ভুত পুরুষ ইহার পরে আমার হৃদয় অধিকার করিয়া প্রভু ও মনিব পদ বাচ্য হন। এখন দেখিতেছি ইনি সেই জনসাধারণের সমালোচিত সাধু বেশ ধারী স্বামীজী আশা করি ভবিষ্যতে আরও কিছু নূতন নূতন নাম আবিষ্কৃত হইবে যাহা হউক এখন হইতে স্বামীজী ও প্রভু শব্দেই তাঁহাকে অভিহিত করিব। প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"কি ভাবছ হে?"—আমি বলিলাম—"কোন্‌টী তোমার আসল নাম সুধাই তোমারে, আর সঙ্গে সঙ্গে কোন্‌টী তোমার আসল রূপ সেটাও বলতে হবে। দেখুন অবিনাশবাবু, সেদিন সমুদ্রের ধারে জনৈক ভদ্রলোক

রহস্যক্রমে স্বামীজীর বহু রূপী ও লাল সাদা বর্ণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

বলছিলেন "লোকটা যেন বহুরূপী ; কখন লাল, কখন সাদা ।" কথাটা তখন ঠিক বুঝিনি, আজ আমার চোখ ফুটলো ।"

স্বামীজী সজোরে বলিলেন—নাহে, না। এখনও সবটা বোঝনি, আর যিনি বলেছেন তিনিও সবটা খুলে বলেন নি। তুমি যে দুটো রংএর কথা শুনেছ তা'ছাড়া আরও একট রং আছে (তাড়াতাড়ি পাশ হইতে একটা মস্ত বড় কাল ওভার কোট বাহির করিয়া গায়ে দিতে দিতে বলিলেন ) আর কখনও কাল। বুঝেছ হে। (পরে হাসিতে হাসিতে ) মন্দই বা বলেছ কি ? এই দেখ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত দিয়ে মিলিয়ে দিচ্ছি ;—প্রথমেই বেদান্তের স্কন্ধে ভর ক'রে চোখ বুজিয়ে বলে নিতে হচ্চে "আমি সেই ব্রহ্ম।" প্রমাণ যথাক্রমে অথর্ব্ব বেদীয় মাণ্ডুক্যান্তর্গত "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকান্তর্গত "অহং ব্রহ্মাস্মি" এবং সাম বেদীয় ছান্দোগ্যান্তর্গত "তত্ত্বমসি" এই তিনটী মহাবাক্যই যথেষ্ট। তার পর "তদৈক্ষত বহুস্যাং" বচনের দ্বারা আমার স্বেচ্ছায় বহুরূপ ধারণও সিদ্ধ হইল সুতরাং ভদ্রলোক অশাস্ত্রীয় কিছু বলেছেন, এ কথা বলতে পার না। এখন রংএর কথ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে "অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং" এই শ্লোকের দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে লাল, কাল ও সাদা এই তিন রংএ বর্ণনা করা হয়েছে। পুরুষ নির্গুণ ও নির্লিপ্ত হয়েও প্রকৃতির সংস্পর্শে প্রকৃতির ন্যায় লক্ষিত হন, তাঁহার নিজের কোন বর্ণ না থাকলেও প্রকৃতির বিশিষ্ট ঐ তিনটি বর্ণে প্রথম রঞ্জিত হয়ে শেষে বহুবর্ণে বিভক্ত হ'তে হয়। "য একো'হবর্ণো বহুধা শক্তি যোগাদ্ বর্ণাননেকান্" এই শ্রুতিতে একবর্ণে বহুবর্ণ ও একরূপে বহুরূপের কথা স্পষ্টই বলা হয়েছে। এখন বুঝে দেখ, আমি বহুরূপী এ কথা মিথ্যা নয় এবং লাল সাদার কথাও তারা মিথ্যা বলেনি, বরং তার পরেও আর একটা কাল রংএর কথা বলতে ভুলে গেছে গো, ভুলে

গেছে শুধু তাই বা কেন, আমি বহুবর্ণে বিভক্ত তবে এই বহু বর্ণ ও বহুরূপ আমার উপাধি মাত্র; স্বরূপে আমি এক, অদ্বিতীয়, অরূপ, অবর্ণ। এই যেমন জামা কাপড়ের লাল, সাদা, কাল বাদ দিলে আমি যে মানুষ সেই মানুষ খোলসটা নিয়েই যত ভেদ জ্ঞান

ইহার পর স্বামীজীর সহিত অবিনাশবাবুর যে ঘোর তর্কের অভিনয় হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ যোগ্য। অবিনাশবাবু স্বামীজীর সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু উভয়ের তর্ককালে আমি মহা ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম আমার বিশ্বাস, শুধু আমি কেন যে কোন ব্যক্তিই সেই তর্ক—বিচারকালে উপস্থিত থাকিলে আমারই মত ভ্রান্তি জালে জড়িত হইতেন কে জানে ইহাদের অন্তরে মধু বাহিরে গরল। "মুখে মধু অন্তর গরল" এই প্রসিদ্ধ বাক্যই চিরদিন প্রচারিত; এমন বিপরীত ব্যবহার জগতে আজ নূতন দেখিলাম পরে আমি এই শুভ সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলাম যে উভয়ে উভয়ের গুণের পক্ষপাতী। তর্কের মধ্যে স্বামীজী—প্রাচ্যের চেতনবাদ বা আত্মবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর অবিনাশবাবু পাশ্চাত্যের জড়বাদ অবলম্বন করিয়া বিরোধ উত্থাপন করিলেন। তর্ক করিবার ভঙ্গিমা উভয়ের অস্বাভাবিক ছিল। বাহ্যতঃ বোধ হইতেছিল, উভয়েই স্বীয় স্বীয় মতের পক্ষে দৃঢ় সংস্কার পোষণ করেন এবং বিরোধী মতটির উপর বিশেষ বিরক্ত। এমন কি পরস্পরের প্রতি কটু কাটব্য ও ব্যঙ্গোক্তি ব্যবহারও করিতেছিলেন, অবশ্য তাহা ভদ্রোচিত রুচি সঙ্গত। প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপী অবিশ্রান্ত তর্ক চলিবার পর যাহা সিদ্ধান্ত হইল তাহা বড়ই সন্তোষ জনক। আধ্যাত্মিক

স্বামীজীর সহিত অবিনাশবাবুর তর্কাভিনয়। জড় চেতন বা আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক নীতির অপূর্ব্ব সমন্বয়

নীতি ও ব্যবহার নীতির এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই, জড় চেতন রূপী পরস্পর দুইটি বিরোধীবাদের মধ্য দিয়া এমন পবিত্রপন্থা পূর্ব্বে কখন সৃষ্টি হইয়াছে কিনা জানিনা কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে সেই সমুদয় অপূর্ব্ব বিচার রাশি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করা অসম্ভব যদি কখন দিন পাই, মুদ্রাযন্ত্রের খরচ যোগাইবার সামর্থ্য হয়, তখন ঐরূপ অনেক অমূল্য বস্তু প্রকাশ করিয়া ধন্য হইব আশা রহিল তবে সজ্জন বর্গের নিকট জলযোগের মত আজ যৎকিঞ্চিৎ উপস্থিত করিবার প্রলোভনও ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, অবশ্য ইহাতে আপনাদের উদরপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই, সেজন্য যেন বিরাগ ভাজন না হইয়া পড়ি।

অনেক সময় ধরিয়া তর্কবিতর্ক হইবার পর অতি সহজ স্বরে স্বামীজী বলিলেন, "দেখ, এই যে জড়বাদ ও চেতনবাদ এবং আধ্যাত্মিক ও ব্যবহার নীতির বিরোধ আন্দোলন, ইহ সুদীর্ঘ বৈদিক যুগ থেকেই চলে আসছে জড়বাদটা যে নব্য পাশ্চাত্যের আমদানী তা' নয় চার্ব্বাক দর্শনের আদিম বক্তা বা আদি চার্ব্বাক প্রাচীর দেবগুরু বৃহস্পতি। অবশ্য বর্ত্তমান কালে সেই জড়বাদের অঙ্গ সৌষ্ঠব ও দৃঢ়তা অনেক উন্নত ধরণের একথা অস্বীকার করি না আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সুদীর্ঘকাল উভয়ে বিদ্বেষ দৃষ্টিতে উভয়পক্ষের বিনাশ সাধনের চেষ্টা করিয়াও একে অন্যের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারেন নাই। বরং দুটী দলেরই শক্তি-সামর্থ্য বাড়ে বই কমে নাই। আমিও যে এতক্ষণ এই অনর্থক তর্কে রত ছিলাম, উহা কোন মত বিশেষের প্রতিষ্ঠার জন্য নয় পরন্তু এই বিরোধী দুই ব্যক্তির কেহই খাট নহেন সেইটী প্রতিপন্ন করিবার জন্য। যদি দুইটী প্রতিভাবান ব্যক্তি এই দুইটী মতের পক্ষ গ্রহণ ক'রে তর্ক আরম্ভ করেন, তা হ'লে এই ক্ষুদ্র দুই ঘণ্টা ত :রের কথা কোন কালেও একজন আর একজনের মত অচল করে দিতে

সমর্থ হবে না বস্তুতঃ চেতন থেকে এই বিশ্বের সৃষ্টি একথা সমর্থন করতে গেলে যে দোষ ঘটে, জড় থেকে বিশ্বের সৃষ্টি সেটা স্বীকার করতে গেলেও সেই দোষ-দুষ্ট হয়ে পড়ে মূলে যদি এক অদ্বিতীয় চেতন থাকবে তবে সহকারী কোন কারণ না থাকায় সেই বিশুদ্ধ চেতন থেকে কি করে জড়ের সৃষ্টি হ'তে পারে? জড়পক্ষেও ঠিক এই কথা। চেতনবাদীরা এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করলেও তাহা যথেষ্ট হয় নাই। "যাহা জড় দেখা যায় ইহাও সেই চেতন" ইহা খুব উপযুক্ত প্রমান বলে বোধ হয়না তেমনি "স্বভাব বশে ক্রমবিকাশের মাথায় জড় হ'তে চেতনের উৎপত্তি" এইরূপ প্রমাণও ঠিক ঠিক মনে ধরেন অর্থাৎ মূলে যদি এক জড় থাকবে তবে সেই জড় থেকে কি করে চৈতন্যের আবির্ভাব হ'তে পারে, এ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না উভয়ের ঐ একই কথা, যথা—রূপান্তর জড়, চেতন অথবা রূপান্তর চেতন, জড় বাদ্ হিসাবে উহা বিচার এপিঠ আর ওপিঠ, কিন্তু গন্তব্য হিসাবে উভয়েরই গতি এক সাংখ্যাচার্য্য কৌশলে জড় চেতনের এই নিত্য বিরোধ ভঞ্জন করতে গিয়ে উভয়ের নিত্যত্ব স্বীকার করেছেন এবং সেই কারণে আবার অদৃষ্টকে মধ্যস্থ মানতে হয়েছে ভক্তিবাদীরা আবার ঐ জড় চেতনের নিয়ন্ত্রণকারী একটী মূর্ত্ত চেতনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এইরূপ আরও বহুবিধ মতের মধ্য দিয়া আমি একটী পরম সত্যের আভাস পেয়ে থাকি, যিনি ঐ জড়চেতনের অতীত আবার জড়চেতনরূপী যিনি উহাদের প্রভু, মধ্যস্থ এবং আত্মা অথবা উক্ত জড় চেতন যাঁর শরীর সেই এক অথবা বহু—এমন এক অনির্বচনীয় অজ্ঞেয় বস্তুই তত্ত্বের সার যাঁকে ভাষা দিয়ে সম্যক বুঝান যায় না অথচ যিনি বুঝিবার জিনিষ, যিনি কখনও প্রত্যক্ষীভূত নন অথচ তাহা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছেনা যিনি সাকার, নিরাকার, জড়চেতন ইত্যাদি সমস্ত বিরোধী পদার্থের একমাত্র

আশয় সেই মহান হ'তে মহানতর বস্তুই সকলের উপাস্য। তবে যে যেরূপ ধারণায় ভজনা করে তিনি তদ্রূপেই তাহার নিকট প্রকটিত হন

আমি পূর্ব্বেই বলে এসেছি গন্তব্য হিসাবে উভয়ের গতি এক—একথা জ্বলন্ত সত্য একজন একনিষ্ঠ অখণ্ড চেতনবাদী যে স্থান লাভ করবেন, আর একজন একনিষ্ঠ জড়বাদীও তদাতিরিক্ত কোন স্থানে যাইবেন না, ইহা নিশ্চিত। তবে ঐ একনিষ্ঠ কথাটা লক্ষ্য করতে হবে, একনিষ্ঠ হওয়া একান্ত দরকার। একনিষ্ঠ জড়বাদী বা চেতনবাদী উভয়েই অনাসক্ত, নচেৎ তাঁদের বাদের সার্থকতা থাকে না মনে কর একজন জড়বাদী। এখন এই জড়বাদী হ'তে হ'লে চেতন জিনিষটাকে অস্বীকার করা ও ব্যবহারিক সত্যে আস্থাবান হওয়া এই তুইটী উপকরণ সংগ্রহ আবশ্যক। এখন বুঝে দেখ, এই ব্যবহারিক সত্যে আবদ্ধ হওয়াটা কার ধর্ম্ম—জড়ের না চেতনের? ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য স্বভাবের বশবর্ত্তী মেসিনের মত মস্তিষ্কে আসক্তির কোন সংস্কার দাঁড়াইতে পারেনা। যিনি ভোক্তা ও কর্ত্তা হবেন সেই যে চেতন—সে ত মিথ্যা; তবে সংস্কার জ'ম্‌বে কার? মাথা থাকলে ত মাথা ব্যথা! যার আসক্তি তার অস্তিত্বই যখন একটা ভ্রান্তির প্রতীক অথব পাঁচমেশালী একটা যন্ত্র বিশেষ—তার মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য আবার কি জমা থাকতে পারে? যাহা জড়বিকার বা ক্ষণবিজ্ঞান নামে অভিহিত, তার মধ্যে কখন স্থায়ী সংস্কারের আশঙ্কা হ'তে পারেনা। সুতরাং সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য যে অনাসক্তি তাহাতে প্রকৃত জড়বাদী সিদ্ধ—মুক্তি তাঁহাদের করতলগত। তবে মনে রাখা উচিত একনিষ্ঠ জড়বাদী হওয়া সহজ কথা নয়, চেতনবাদীদের সাধন ভজন ও জ্ঞান চর্চ্চার মত এঁদেরও শ্রমসাধ্য পথ অতিক্রম করতে হয়। "যেমন চিন্তা, তেমনি গতি" একথা আধ্যাত্মবাদীরা স্বীকার করে থাকেন। সুতরাং জড়বাদীদের ঐ চিন্তার গতিতে তাদের মুক্তির আর অবরোধ কি থাকতে পারে?

তারাও ত দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলে থাকেন—'ন স্বর্গো নাপবর্গ বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ " ঈশ্বর না মানলেই যে মুক্তি হয়না এবং তাঁদের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতার নাম গন্ধ ঢুকতে পারেনা, সে কথা স্বীকার ক'রে খুব সুবিবেচকের পদ লাভ করা যায় না এই গেল জড়বাদীর কথা চেতনবাদীদের সম্বন্ধে বোধহয় বেশী বল্‌তে হবেনা কেননা ঈশ্বরবাদী ও চেতনবাদীদের মধ্যে মুক্তির জন্য ভূরি ভূরি শাস্ত্র দৃষ্টান্ত রয়েছে, তাঁরা অন্তে চিন্ময়রাজ্যে প্রবেশ করেন অধিক করে বলা নিষ্প্রয়োজন মোটের উপর তাদেরও সেই এক চেতন সত্বা অবলম্বন করে সমস্ত জড়জগতকে অনিত্য বল্‌তে হবে। ওদের মতনই জগতকে হয় ভ্রান্তির প্রতীক মায়া অথবা চেতনের বিকার ইত্যাদি না বলে পারা যায়না উদ্দেশ্য জগতের হাত হ'তে অব্যাহতি পাওয়া বা আসক্তির সংস্কার সঞ্চয় হ'তে না দেওয়া উভয়েরই সূক্ষ্মাগ্রভাগ এক অনাসক্তির রাজ্যে প্রবেশ করেছে প্রকারান্তরে উভয়ের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় আছে যুক্তি প্রমাণও যথেষ্ট দেওয়া যেতে পারে।

এখন আধ্যাত্ম পথ ও ব্যবহারিক পথের কথা। আমার মনে হয় এর মধ্যে যার য, তার তাই শ্রেয় ব্যবহারিক পথে সকলেই কর্ম্মমার্গের সমর্থন করেন অবশ্য এই কর্ম্মকাণ্ডে আধ্যাত্মিক প্রেরণার বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলে পথ আরও সহজ ও সুগম হয় অনেকে একথা মেনে নিতে কুণ্ঠিত হ'তে পারেন কিন্তু তাঁদের একটী কথ স্মরণ করে দিচ্ছি—নৈতিক জগতকে ত তারা অস্বীকার করতে পারবেন না! সর্ব্বদেশের ব্যবহারিকেরা নীতি শৃঙ্খলতার পক্ষপাতী। আমার মনে হয় আধ্যাত্মিক শক্তির অভাবে উহাই যথেষ্ট প্রকারান্তরে নীতির মধ্যে যে সব বন্ধন আছে উহা স্বার্থত্যাগ বা আত্মসংযমের জন্য ব্যবস্থিত। যেখানে ভোগের রাজ্যে কোন স্বাধীনতা নেই সেখানকার সেই ভোগ-

কর্ত্তার যে অনাসক্তির পক্ষপাতী সেটা একবাক্যে সকলের স্বীকার করতে হয় স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় সকলে কেন নৈতিক বন্ধনের প্রাচীর তুলিয়াছেন ? প্রকারান্তরে উহা আধ্যাত্মিকতারই রূপান্তর মাত্র যেমন, ক্রমান্বয়ে উহা আমাদের চিত্ত সংযমের পথে টানিয়া লয় কোন্ দেশে, কোন্ ধর্ম্মে, অথবা কোন্ সভ্যসমাজে এই নীতি ও ত্যাগের আদর নেই ? আধ্যাত্মিক না মানিয়া শুধু ব্যবহারকে যাঁহারা সারসর্ব্বস্ব করেন তাঁহাদিগকে কোন নীতির দিকে তাকাইবার আবশ্যক হয়না, জগতের মধ্য হইতে স্বার্থ বাছিয়া লওয়াই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে। নৈতিক বিধি আধ্যাত্মিক পথের নিম্ন অধিকারীর পক্ষে। সুতরাং আধ্যাত্ম, ঈশ্বর, জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করলেই যে অধ্যাত্মিক পথের পথিক হ'ল, নইলে হ'লনা একথা কেমন করে মানতে পারি। যত যাই বল, বেশ সহজ এবং সরল দৃষ্টিতে তাকালে আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিকে কোন বিরোধ দেখা যাবে না।

এইরূপে বেলা প্রায় সার্দ্ধ চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনার পর স্বামিজী সহ আমরা সমুদ্রতীরে অবতীর্ণ হইলাম। ভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া অনিমেষনয়নে সেইদিকে চাহিয়া আছি, এমন সময় স্বামীজী বলিলেন—"দেখ, গায়ত্রীতে এই সবিতার অভ্যন্তরে সেই মহাজ্যোতির কল্পনা করতে আদেশ দিয়েছেন খুব ভাল করে তাকিয়ে দেখ দেখি, পরে বিচার করে বলত এ আদেশের তাৎপর্য্য কি ?" কিছুক্ষণ খুব তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে হঠাৎ যেন আমার চক্ষু ঝলসিয়া উঠিল এবং সূর্য্যের মধ্য হইতে কেমন যেন একটা স্নিগ্ধ জ্যোতি সমুদ্ভাসিত হইয়া চারিদিক খুব ঘন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। এই জ্যোতির একটু বিশেষত্ব ছিল, সূর্য্যের যে তীব্র উত্তাপ

জ্যোতি দর্শন। গায়ত্রীর উদ্দেশ্য জ্যোতির মধ্য দিয়া চিত্ত সমর্পণ।

তাহা উহাতে ছিল না ক্রমেই যখন সেই জ্যোতি গাঢ় হইতে গাঢ়তর ভাব ধারণ করিয়া খুব ঘন হইয়া আসিতেছিল, তখন পার্শ্ববর্ত্তী জনসমূহ কেহই আমার দৃষ্টির সামনে আসিতেছিল না এইরূপে ক্রমান্বয়ে আমার অন্তর পর্য্যন্ত যখন জ্যোতিতে ঢাকিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে এবং বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া আসিতেছে, সেই সময় স্বামীজী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"থাক হে বাপু এত লোকজনের ভিতর অমন নির্লজ্জের মত দেখে না, খুব হয়েছে" তাঁহার এই আহ্বান বাণীতে আমার সেই অপরূপ জ্যোতির রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল বটে, কিন্তু আবছায়া মত উহার প্রতিক্রিয়া অনেক্ষণাবধি আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল স্বামীজী পুনরায় বলিলেন, জগতে যত পৃথক পৃথক জ্যোতির কেন্দ্র আছে তন্মধ্যে এই সূর্য্যটাই সব চেয়ে বড় পূর্ব্বেই বলে এসেছি ভগবানকে জানার পথ বহু এবং সেই পথগুলি আবার পরস্পর পৃথক, অথচ উদ্দেশ্য এক, এই জ্যোতির ভেতর দিয়েও ব্রহ্মে পৌঁছিবার পথ আছে বেদান্ত দর্শনের "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" থেকে "উপদেশ ভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ" পর্য্যন্ত চারিটী সূত্রে বিশেষভাবে এই জ্যোতিই ব্রহ্ম সে কথার মীমাংসা করা হয়েছে।

গায়ত্রীতে যে ভর্গাখ্য তেজের কথা বলা আছে সেটা এই তেজ; যে তেজের এক কণিকায় কোটী কোটী সূর্য্য আলোকিত হয়। এই দৃশ্যমান সূর্য্যকে কখনও ধ্যান করবার কথা বলা হয়নি, যে তেজের দ্বারা এই সূর্য্য বা যাবতীয় প্রকাশ্য নিচয় প্রকাশিত হয়, তাহাকে লক্ষ্য করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। "তমেবভান্তমনুভাতিসর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" গায়ত্রী বলতে শুধু ছন্দকে বোঝা উচিত হয় না, "তথা চেতোঽর্পণ নিগমাৎ" অর্থাৎ এইরূপ ধ্যান করতে করতে ক্রমান্বয়ে চিত্ত সমর্পণের বিধি ব্যবস্থা আছে। শুধু মুখের বুলি আওড়ান নয়।

এখন বুঝতে হবে যে, এই দৃশ্যমান সূর্য্য বিন্দুতে যে গায়ত্রী প্রতিপাদ্য ভর্গাখ্য তেজকে ধ্যান করবার কথা সেটা চিত্ত সমর্পণের উপায় মাত্র "যে এষোহন্তরাদিত্যে হিরন্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে, * * * ইত্যধি দৈবতম্," "অথাধ্যাত্মম্ অথ য এষোহন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে।" ইহার অর্থ ঐ যে আদিত্যের অভ্যন্তরে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ অবস্থিত, এবং এই যে অক্ষি গোলকে একটী পুরুষ বিদ্যমান দেখ যায়, উভয়েই এক ধর্ম্মি। এই শ্রুতির দ্বারা বাইরের সমষ্টি জ্যোতি বা জ্ঞানের সহিত জীবের হৃদয় অভ্যন্তরস্থ জ্যোতি বা জ্ঞানের অভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ জীবের অহঙ্কার সমাশ্রিত চিত্ত ঐ বিরাট জ্যোতির চিন্তায় তন্ময় হয়ে সেই ব্রহ্ম জ্যোতির উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে। এই যেমন একটু আগে তোমার অবস্থা হয়ে আসছিল, আর একটু হলে গেছিলে আর কি। ওগো, সে যে জ্যোতির সমুদ্র! ঊর্দ্ধ, অধঃ, পার্শ্ব, অন্তর, বাহ্য—সব জ্যোতির্ম্ময়; আর কিছুই নাই, কেবল অনন্ত জ্যোতি "ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।"

সূর্য্যাস্তের পর আরও কিছুকাল এদিক ওদিক ঘুরিয়া বাসায় আসিলাম। ফিরিবার পথে বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে আবার একবার সেই চিন্তা—কি আশ্চর্য্য প্রভাব! অন্যের কথা বাদ দিয়া স্বীয় প্রাণের নিকট প্রমাণ গ্রহণ করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, যোগ পথ অবলম্বন করিয়া অনেকদিন কঠিন পরিশ্রমের পর যে সামান্য জ্যোতির অংশ দেখিতে পাইয়াছিলাম, আজ অতি সহজে এক মুহূর্ত্তে সেই মহা জ্যোতির পরিপূর্ণ অবয়ব আমার নিকট হাজির। এ কি কুহলিকা, না ইন্দ্রজাল! যাই হ'ক অদ্ভুত সামর্থ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যাবতীয় বিভূতি, মুক্তি ইত্যাদি আমার প্রভুর করতলগত—আমলকি ফলবৎ ইনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে এই বস্তুগুলি ব্যবহার করিতে পারেন। অনুগ্রহ

ও নিগ্রহ করিবার ক্ষমতা এতাদৃশ ব্যক্তির মধ্যেই আবদ্ধ, অন্যের পক্ষে শুধু গর্ব্বোক্তি মাত্র অহো, আজ আমি ধন্য, মানুষের যদি কোন স্থলে ন্যায্য গর্ব্ব করিবার কিছু থাকে তাহা আজ আমারই প্রাপ্য। যিনি ভার সহিতে পারিবেন, পাপের বোঝা অক্লেশে বহিতে পারিবেন তাঁহারই উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। আমি গর্ব্ব করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে পারি, জগতে আজ আমার মত সুখী কেহ নাই এখন এই প্রার্থনা করি—"দে'খ প্রভু! যেন বঞ্চনা কর'না, কতকাল প্রবঞ্চনা করে দূরে ঠেলে রেখেছ, এবার আর চরণ ছাড়া ক'রনা!" ভাবের-আবেশে গান গাহিতে গাহিতে চলিলাম—

> অনুগত জনে প্রভু করো না আর প্রবঞ্চন,
> তুমি, রাখিলে রাখিতে পার মারিলে কে করে মানা,

## ৫

## পরিচয়

স্বামীজীর সহিত গুরুদাস ব্রহ্মচারী নামক একজন ভক্ত ছিলেন, ব্রহ্মচারীর বয়স আন্দাজ বাইশ কি তেইশ বৎসর হইবে শরীর দৃঢ় ও সবল, মুখখানিও বেশ দৃঢ়তা ব্যঞ্জক। সর্ব্বদা গৈরিক বসন ব্যবহার করিতেন, চাল চলনও একেবারে আড়ম্বর শূন্য ছিল পরিচয় হইবার পর তাহার আন্তরিক চিন্তার গতি লক্ষ্য করিতে থাকিয়া বুঝিলাম, গুরুদাসের হৃদয় খুব উচ্চ এবং বৈরাগ্য প্রবণ ব্রহ্মচারী বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী হিসাবে কম শিক্ষিত হইলেও তাহার মধ্যে যে একটা উজ্জ্বল প্রতিভা ছিল, সেটা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমি অবগত হইয়াছিলাম।

গুরুদাস ব্রহ্মচারী ও তাহার আন্তরিক প্রেম।

বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ ছিল, সেই সঙ্গে ত্যাগ ও তিতিক্ষা মিলিত হইয়া মণি কাঞ্চন সংযোগ হইয়াছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—স্বামীজীর উপর তাহার একনিষ্ঠতা, কথায় কথায় জানিয়াছিলাম স্বামীজী ব্যতীত জগতে তাহার দ্বিতীয় ভালবাসার কেহ বা কিছুই নাই এবং তারা ঐ স্বামীজীকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম সমুদ্রে সে তাহার জীবন তরণীখানি ভাসাইয়া দিয়াছে; সবখানি মন প্রাণ দিয়া সে তাই স্বামীজীর সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিত। দেখিয়া আমি সেবানন্দ প্রাপ্তির আশায় মুগ্ধ হইয়া পড়িতাম

এই একনিষ্ঠ ভক্তটীর উপর স্বামীজীর ব্যবহার কিন্তু স্বতন্ত্র ধরণের ছিল আদর ভালবাসার কথা দূরে থাক, গুরুদাসের মুখপানে তাকাইয়া স্বামীজীকে কোনদিন হাসিতে দেখি নাই হয়ত একস্থানে আমাদের লইয়া স্বামীজী খুব আনন্দ করিতেছেন, খুব হাসির লহর উঠিতেছে কিন্তু যেমন গুরুদাস আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি তাঁহার হাস্যোদ্দীপক বদনখানি গম্ভীর হইয়া আসিল স্বামীজীর যাবতীয় কার্য্যের পক্ষপাতী হইলেও গুরুদাসের প্রতি এই কড়া ব্যবহারটা আমার প্রিয় ছিল না, প্রাণ দিয়া যে ভালবাসে, তাহার প্রতিদান কি এইরূপ? অবশ্য ইহার মধ্যে কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ থাকা সম্ভব, এ কথাটী যে ভাবিতাম না এমন নহে। তত্রাচ ভাবপ্রবণ হৃদয় বলিয়া হউক, অথবা নিজে ব্যবসায়ী ভালবাসা পোষণ করি বলিয়াই হউক, গুরুদাসের এই মোটা লোকসানটা কিছুতেই হজম করিতে পারিতাম না হয়ত অজ্ঞাতসারে শঙ্কা হইত, আমিও ত এমনি করিয়া প্রাণ ঢালা ভালবাসিব, তখন যদি প্রতিদান না পাই? কিন্তু হায়! তখন বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারি নাই যে ভালবাসিলে আর ভালবাসা পাওয়ার দরকার হয় না। আরও আশ্চর্য্য হইতাম, যখন প্রসন্নমুখে গুরুদাসকে স্বামীজীর এই কঠোর

গুরুদাসের প্রতি স্বামীজীর ব্যবহার।

ব্যবহার বরণ করিয়া লইতে দেখিতাম। একদিন গুরুদাসকে ধরিয়া বলিলাম—বলত, ভাই, স্বামীজীর এই নিষ্ঠুর ব্যবহার তোমার প্রাণে কতখানি আঘাত দেয়? উত্তরে যাহা আশা করিয়া ছিলাম তাহার নাম গন্ধও পাইলাম না; আমার থোঁতা মুখ ভোঁতা হইয়া গেল কোথায় ভাবিয়াছিলাম, সে স্বামীজীর ব্যবহারের জন্য ব্যাকুল ভাবে আমার নিকট মনের ব্যথা জানাইবে আর আমি তাহার ব্যথায় সমবেদনা জানাইয়া প্রবোধ দিব ও স্বামীজীকে জানাইয়া প্রতিকারের আশ্বাস দিব, তাহা না হইয়া সে বলিল—আমিত ঐরূপই চাই, আদরে যদি গর্ব্ব আসে. যদি কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হই। তাঁকে ভালবাসা আমার স্বায়ত্বাধিকার, ভালবাসা চাওয়াটা অনধিকার বলিয়া মনে করি। ধন্য! ধন্য তুমি গুরুদাস! সার্থক তোমার ভালবাসা, সার্থক তোমার স্বামী সেবা। অবাক হইয়া গুরুদাসের এই আশ্চর্য্য চরিত্র ভাবিতেছিলাম, ইচ্ছা হইতেছিল তাহার পবিত্র চরণ-ধুলি লইয়া মস্তকে ধারণ করি, কিন্তু লজ্জা ও মান ভীষণ প্রতিকূলে ছিল

নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রতি কর্ত্তার্থে অভিযোগ।

গুরুদাস ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে উপযুক্ত ঔষধ সেবন করিয়াও আমি ব্যাধি হইতে একেবারে নিরাময় হইতে পারি নাই। স্বামীজীকে অনেক দিন বলিব বলিব করিয়া বলা হয় নাই, উদ্দেশ্য গুরুদাসের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া সরল মিষ্ট ব্যবহার করুন। একদিন খুব দৃঢ়তার সহিত আঁটিয়া ঝগড়া করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছি, প্রণামান্তে শ্রীচরণে আমার অভিযোগটী সবিনয়ে নিবেদন করিলাম বলিলাম—“অমন অগাধ ভালবাসার প্রতিদান স্বরূপ সেকি একটী মাত্র হাসি, এতটুকু মুখের আদরও পেতে পারে না? আপনার এই ব্যক্তিগত ব্যবহার বৈশিষ্ট দেখে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হই আপনি ত সবদিকেই সাম্যের পক্ষপাতী, আপনাকে সাম্যের প্রতীক বলিলেও অত্যুক্তি

হয় না তবে এখানে কেন এমন বৈচিত্র ভাব?" স্বামীজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"কারণ শুনবে? তবে শোন,—অবশ্য গুরুদাসের ভালবাসা এখানে সমালোচনার বিষয় নয়, কেন না আমার ব্যবহারের মধ্যেই তোমার প্রশ্ন ও উত্তর বিদ্যমান আছে দেখ, ওকে খুব বেশী ভালবাসি, তাই মুখে ভালবাসা দেখাতে হয় না। ও নিজেও তা চায়না, কেন না সে আমার ভালবাসার গতি কিছু কিছু বোঝে" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন—"ভালবাসা নেওয়ার অধিকারী চাই, দেওয়ার অধিকারীও বিবেচ্য। ভালবাসার লেনা দেনায় খুব সতর্কতা প্রয়োজন। এই ভালবাসায় মানুষকে দেবতা করে, আবার নরকের কীট পর্য্যন্তও করতে পারে যাক্ ও সব কথা পরে হবে" লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম স্বামীজীর ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কিছুক্ষণ অবাক থাকিয়া অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম।

ডাক্তারের পরিচয় ও চারি বন্ধুর কথা।

তাহার পর ডাক্তার বাবুর পরিচয়। ইনিও স্বাস্থ্যের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে সমুদ্রতীরবাসী হইয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি সকলেই ছিল। মাণিক লাল ও সাধুচরণ নামক দুইটী ভদ্রলোকের সহিত ডাক্তার বাবুর আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়, পরে সেই সূত্রে স্বামীজীর সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। পরস্পর চারিটী প্রাণের মধ্যে যখন সখ্যভাব খুব প্রবল হইয়া উঠে, সেই সময় পুরীর প্রথানুযায়ী পরস্পর "মহাপ্রসাদ" পাতাইয়া বন্ধন আরও দৃঢ় করা হইয়াছিল। মন্দির সংলগ্ন আনন্দ বাজারে বসিয়া ৺জগন্নাথ সাক্ষী রাখিয়া এই "মহাপ্রসাদ" পাতান হয় সেই সময় একটী উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ঘটে। প্রায় এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে বোধ হয় ৬০ কিম্বা ৬৪ লাইন পদ্যে স্বামীজী একখানি স্মৃতিপত্র রচিত করিয়াছিলেন এইরূপ বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ হইবার

পর হইতে শ্রীযুক্ত মাণিকলাল ও ডাক্তার বাবু বিশেষ ভাবে স্বামীজীর সঙ্গ করিতে থাকেন কিছুদিনের মধ্যেই উভয়ে স্বামীজীর একান্ত ভক্ত হইয়া উঠেন সাধুচরণের ভাগ্যে এই স্বর্ণ সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই, খুব সম্ভব সঙ্গের স্বল্পতা বশতঃ।

ডাক্তারটীর নাম বিজয় গোবিন্দ গোস্বামী (চক্রবর্ত্তী), রাজসাহী জেলায় নিবাস ইনি সংযত ও বিচারবান চুল চেরা বিচার করিয়া নিজের দৈনন্দিন কর্ম্মের নিয়ম সংস্থাপিত করিতেন। স্বামীজীর অনুরক্ত হইয়া যখন তাঁহাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন, তখনও তিনি তাঁহার প্রিয় বিচার ও নিয়মের হাত হইতে অব্যাহতি পান নাই তবে বর্ত্তমান কার্য্যাবলীতে বিশেষত্ব ছিল এই যে, সমস্ত নিয়মগুলি স্বামীজীর আদেশ বা ইচ্ছানুযায়ী করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য বিচার করিতেন স্বামীজীর আদেশগুলি ঠিক ঠিক বুঝিবার জন্য ডাক্তার বাবু যখন মাথা খাটাইতেন, তখন তাহা সকলেরই হৃদয়াকর্ষক হইত পূর্ব্বে তিনি ভিন্ন স্থানে বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতেন, পরে ভক্তগণ দেশে চলিয়া গেলে স্বামীজীর বাসায় আসিয়া এক সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন

গুরুদাস ব্রহ্মচারী ও ডাক্তার বাবুর নিকট স্বামীজীর পূর্ব্ব বিবরণ জানিবার জন্য তাগিত করিতে লাগিলাম। কিন্তু যেমন গুরু তেমনি চেলা, সহসা কিছু কবুল করান মুস্কিল অনেক জেরা করিয়া কিছু কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হইল বটে কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ। এঁরা উভয়েই স্বামীজীকে মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করেন। শুনিলাম, স্বামীজী কয়েক বৎসর যাবৎ হিমালয়ের কোন কোন নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি করিয়া সাধন ভজন দ্বারা মহান সত্যে সিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহার সাধকাবস্থার ত্যাগ ও কঠোরতা নাকি খুব বিস্ময়কর গুরুদাসও তাঁহার আদর্শে একবৎসর যাবৎ হৃষীকেশ অঞ্চলে

স্বামীজীর যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়

বাস করিয়া আসিয়াছে। পরে স্বামীজী পরিব্রজ্যাবলম্বন করিয়া যদৃচ্ছ ভ্রমণে সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ করিয়াছেন; এখনও প্রায় সেই ভাব। এক স্থানে বেশী সময় থাকা তাঁহার ঘটিয়া উঠে না। ভ্রমণকালীন তাঁহার নিরালম্ব অবস্থার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য একখানি মাত্র কাপড় ও গামছা এবং একটী কমণ্ডলু ব্যতীত তাঁহার নিকট দ্বিতীয় কোন বস্তু থাকিত না। কোনদিন একটী পয়সা পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন নাই তাঁহার সমস্ত বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল; যে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিত সেই অসাধারণ প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলিত স্বামীজীর নিকট কোন সাম্প্রদায়িক পরিচয় পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তিনি কোন সম্প্রদায় বিশেষ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই অথচ বিগত চারি বৎসর সাধনাবস্থায় খুব কড়া সন্ন্যাসের নিয়ম পালন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি সেইরূপ কঠিন নিয়ম আর প্রতিপালন করেন না মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমস্ত নিয়ম বন্ধনও শিথিল হইয়া গিয়াছে বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার ত্যাজ্য গ্রাহ্য বিশেষ কিছু ছিল না, সকল কার্য্যের মধ্যেই তাঁহার নিদারুণ অনাসক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইত তাঁহার মধ্যে অনেক সময় বাল্য ভাবের প্রকাশ দেখা যায়, কখন বা ক্ষিপ্তের মতও ব্যবহার করেন আবার সাধারণ ভাবও বটে

বর্ত্তমান সময় স্বামীজীর নাম শ্রীমৎ অচলানন্দ স্বামী। নামের কথা উঠিলে তিনি বলিতেন, "ইহা আমার প্রকৃত নাম নহে প্রকৃতপক্ষে আমার কোন নামই নাই তবে লোক ব্যবহারে একটী নামের দরকার সেটা ভবিষ্যতের কোটায় ঢাকা রয়েছে" স্বামীজী কোন এক সময় যদৃচ্ছাভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে নবদ্বীপ আসিয়া উপস্থিত হন। সেই সময় বাটীস্থ আত্মীয় স্বজন সন্ধান পায়। অবিলম্বে তাঁহারা নবদ্বীপ আসিয়া পাকড়াও করেন ও লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিলে বিনা আপত্তিতে

তাঁহাদের সঙ্গে বাড়ী যান যে সময়ের কথা বলা হইতেছে সে সময় স্বামীজীর মধ্যে কোন কার্য্যের উৎসাহ বা উদ্যোগ দেখা যাইত না, আবার কোন কার্য্যে বিরক্তি বা আপত্তিও ছিল না তিনি আত্মীয় স্বজনের একান্ত আগ্রহে কয়েকমাস গৃহীর ন্যায় তাঁহাদের সহিত বাস করেন কিন্তু যিনি বিশ্বমানবের কল্যাণার্থে এই ধরাধামে অবতীর্ণ, যাঁহা হইতে জগতে কোন মহানাদর্শের প্রতিষ্ঠা হইবে, যাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া বহু পাপী তাপী অসহায় ব্যক্তি পুণ্যপথে ধাবিত হইবে—এমন মহাপুরুষকে কি কেহ কোন গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারে? ভক্তের পুনরায় তাঁহাকে লইয়া আসিলেন আবার তিনি ধর্ম্মপ্রসঙ্গে ভক্তসঙ্গে আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। বস্ত্রাবরণে কখন অগ্নি ঢাকা থাকে না।

মধু যেখানেই থাকুকনা ভ্রমর ও মক্ষিকা তাহা খুঁজিয়া বাহির করে। সেইরূপ স্বামীজী যদৃচ্ছা ভ্রমণকালে যখন যেখানে থাকিতেন চারিদিক হইতে ভক্তগণ আসিয়া জুটিতেন আলোক যেমন নিজেকে কিছুতেই গোপন করিতে পারে না, সেইরূপ স্বামীজীরও জন-বিজয়ী প্রতিভা কোনদিন গোপন করিতে পারেন নাই। যখন যেখানে যাইতেন সেইখানেই কতকগুলি করিয়া ভক্তের সৃষ্টি হইত তন্মধ্যে নবাবগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সাহার কথা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কেননা, স্বামীজীর পুরী নিবাসের সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নরেনবাবু স্বামীজীর মুখনিঃসৃত কতকগুলি মধুমাখা অমূল্য উপদেশ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতেছেন। ভক্তদের ইচ্ছা, স্বামীজীর নামানুসারে উক্ত গ্রন্থের "অচল উক্তি" নামকরণ করা হইবে। সম্প্রতি স্বামীজীর স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নরেন-বাবু নিজ খরচে তাঁহাকে পুরী পাঠাইয়াছেন। শুশ্রূষার্থে গুরুদাস ব্রহ্মচারী সঙ্গে নিয়োজিত হইয়াছিল দুঃখের বিষয় স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন করিতে তিনি অবহেলা করিতেন উদাসীনতা তাঁহার মর্ম্মগত

অথচ কোন বিষয় বলিলে তিনি উপেক্ষাও করিতেন না। অতি কষ্টে স্বামীজীর এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় বাহির করিলাম কিন্তু তৃপ্ত হইতে পারিলাম না প্রতিজ্ঞা করিলাম, যেমন করিয়া পারি এই মহাপুরুষের জীবনের বিস্তৃত ইতিহাস আমাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে অবশ্য তাহা প্রভুর কৃপা সাপেক্ষ

গুরুদাস ব্রহ্মচারীর নিকট স্বামীজীর চরিত্র শুনিবার মধ্য দিয়া তিনি যে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। তাঁহাতে অনাসক্তির জ্বলন্ত আদর্শ পূর্ব্ব হইতেই আমি লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলাম, আজ আবার সেই ধারণা গুরুদাসের ধারণার সহিত মিলিয়া যাওয়ায় আনন্দ পাইলাম কিন্তু তিনি কখন "বালকের মত, কখন ক্ষিপ্তের মত" এই কথাটীর ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করা আমার পক্ষে দুরূহ হইল। অনেক ভাবিতে ভাবিতে একটীর সুমীমাংসা হইয়া গেল; কোন কোন সময় স্বামীজীর মধ্যে এত সরল ব্যবহার প্রকাশ পাইতে দেখিয়াছি যে তাহার দৃষ্টান্ত পঞ্চম বৎসরের বালক ব্যতীত অন্যে অসম্ভব। তাই স্বামীজী ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে এত ভালবাসেন এইরূপে একটী সমস্যা মীমাংসিত হইলেও অনেক হাতড়াইয়া অন্যটীর কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। উন্মাদবৎ অবস্থা ত, স্বামীজীতে কোনদিন দেখি নাই ? আর অতবড় জ্ঞানবান ব্যক্তির মধ্যে যদি উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে সাধারণ ব্যক্তির অবস্থা কি হইতে পারে ? সে দিনও আমি বুঝিতে পারি নাই যে এই অদ্ভুত চরিত্র মহাপুরুষটীর ভিতর এই দুইটী অবস্থা ব্যতীত আরও অনেক অবস্থা প্রকাশ পায়। কখন জড়বৎ, কখন মাতোয়াল, কখন বা পিশাচবৎ এমন কি মৃত্যুবৎ অবস্থাও সংঘটিত হয়। চিত্ত এবং প্রাণ স্বামীজীর খেলার জিনিষ, যখন যেমন ইচ্ছা তখন সেই ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম—ইহা পরে জানিয়াছিলাম।

৬

## দীক্ষা

যতদিন হইতে স্বামীজীর সঙ্গলাভ করিয়াছি ইহার মধ্যে কোনদিনের জন্য আমার চিত্ত অবসাদপ্রাপ্ত হয় নাই, বেশ আনন্দেই দিন কাটিতেছিল ধীরে ধীরে স্বামীজীর উপর বিশ্বাসের ভিত্তি এত সুদৃঢ় হইয়া গিয়াছে যে কল্প কল্পান্তরেও তাহা নষ্ট হইতে পারে কিনা ধারণায় আসিত না স্বামীজী প্রায়ই বলিতেন—"বিশ্বাস হওয়া ও যাওয়ার মধ্যে আশ্চর্য্য কিছুই নাই, কিন্তু স্থায়ী বিশ্বাস মানুষ ত দূরের কথা উহা দেবতাদিগেরও দুর্লভ বস্তু" তাই সময় সময় শঙ্কা হইত, আর সকাতরে প্রার্থনা করিতাম—"দয়াময়, যদি দয়া করে সৌভাগ্য দিয়াছ, কেড়ে নিওনা, প্রভু' এইরূপ প্রার্থনা করিয়াই যে একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম, তাহা নহে প্রভুর সহিত একটা পাকা পাকি বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রাণ অধির হইয়া উঠিয়াছিল পাকা পাকি বন্দোবস্ত বলিতে অন্য কিছু নয়—দীক্ষা গ্রহণ করিবার অদম্য পিপাসা ভাবিলাম, যদি ভাগ্যবশতঃ এমন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়াছি, তবে আজন্ম সঞ্চিত মনোবাঞ্ছা কেন পরিপূর্ণ না করি। সম্মুখে এমন পূততোয়া সরোবর বিদ্যমান থাকিতে কোন্ মহামূর্খ পিপাসিত অবস্থায় তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে? কত জন্মের সঞ্চিত সুকৃতি আজ আমার সহায় হইয়া এমন সুবর্ণ সুযোগ ঘটাইয়াছে মহাপুরুষ আজ নিজে সাধিয়া যাচিয়া কোলে তুলিয়া লইয়াছেন, হৃদয় উজাড় করিয়া সংশয় রিপু তাড়াইয়া দিয়াছেন, চিরঅন্ধকার পথে প্রেমের দিব্য জ্যোতি দেখাইয়াছেন আমার কিন্তু ঘুমন্ত আলস্য ছাড়িয়াও ছাড়েনা—নয়ন মেলিয়াও মেলিনা। না, এমন নিশ্চিন্ত নীরব অবস্থায় দিন কাটান আর কি সাজে! অদ্যই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লইব।

দীক্ষা লইবার আগ্রহ

মতলব আঁটিয়া স্বামীজীর সন্নিধানে উপস্থিত হইবামাত্র, প্রভু আমায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে! কিছু এঁচে এসেছ নাকি?" আমি ত অবাক, সত্য সত্যই আজ আমি কিছু এঁচেই এসেছি বটে; যাহা হউক এই প্রশ্নের উত্তরে যৎসামান্য হাসি ছাড়া আর কিছু যোগাইয়া উঠিল না। যদিও বুঝিলাম আমার আন্তরিক সংবাদ স্বামীজীর অজানিত নহে, তবুও লজ্জায় মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না। স্বামীজী নিজেই সাধন ভজনের কথা পাড়িলেন। যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটী মার্গ পৃথক পৃথক ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মানবপ্রকৃতির জন্য তিনটী বিভিন্ন পন্থার সার্থকতা নির্দ্দেশ করিলেন। সকলের পশ্চাতে এই তিনটী পথের সমন্বয়ে একটী বিশিষ্ট পন্থার সমর্থন করিয়া বলিলেন—"দেখ, যত শেষ, তত বেশ। এ যুগের সাধনা, এ যুগের সিদ্ধি সব চেয়ে উচ্চ ধরণের। সেই বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত ক্রমানুসারে সহজ ও স্পষ্ট পথের সৃষ্টি হয়েছে।" এই কথা বলিয়া একখানা খাতার পাতা উল্টাইয়া আমাকে পড়িতে দিলেন।

"বলি বলি বলা হলনা।" বর্ত্তমান যুগের সাধনা।

সন্ধ্যার পর বাসায় বসিয়া দুই ঘণ্টা ব্যাপী পরিশ্রমে একখানা পত্র লিখিলাম। পত্রখানিতে দীক্ষা সংক্রান্ত মনোভাবগুলি সঙ্কলিত ছিল। পরদিন প্রাতে সেইখানিকে হাতে করিয়া স্বামীজীর বাসায় হাজির হইলাম, কিন্তু দেখা হইল না। মাথায় একটি যুক্তি যোগাইল, পত্রখানি স্বামীজীর বিছানায় রাখিয়া বিজয় বাবুকে বলিলাম, ডাক্তার বাবু! আপনি নিরপেক্ষ ভাবে ব্যাপারখানা লক্ষ্য করিবেন। পত্র কে দিয়াছে একথা প্রকাশ করিবেন না। হাসিতে হাসিতে ডাক্তার বাবু আমার ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে প্রস্তুত হইলেন। আমি যদিও বাসায় ফিরিলাম কিন্তু ফলাফল জানিবার

পত্রে দীক্ষার কথা জানান। হাতের লেখা না জানিলেও এবং লেখকের স্বাক্ষর না থাকা সত্ত্বেও কাহার পত্র বুঝিতে পারিলেন।

জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। অবশ্য ইহার মধ্যে পরীক্ষা করিবার কোন ভাব ছিলনা; কেননা, সংশয় থাকিলেত পরীক্ষা? তবে একটু আনন্দ কথা অপরাহ্নে ডাক্তারবাবুর নিকট হইতে যেরূপ রিপোর্ট পাইলাম নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল। তিনি বলিলেন—স্বামীজী বাসায় ফিরিয়া—যখন তাঁহার আসনের উপর পত্রখানি দেখিলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। পত্রখানি হাতে না লইয়াই বলিলেন—'ও খানা বুঝি সীতানাথ বাবু দিয়েছে? লোকটা দীক্ষা দীক্ষা করে ক্ষেপে না যায়;" পত্রখানি যে আমার সে কথা তাঁহার জানিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধ ছিল। প্রথমতঃ আমার হাতের লেখা তাঁহার অপরিচিত। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে আমার মত বহু ব্যক্তি তাঁহার বাসায় যাতায়াত করিতেন, তৃতীয়, পত্রের নীচে কাহারও কোন স্বাক্ষর ছিল না।

দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণের দোল যাত্রা সমাগত হইল। ৺পুরীধামে রাস, রথ এবং ঝুলন যাত্রা উপলক্ষে খুব বেশী আড়ম্বর ও বহুযাত্রীর সমাগম হয়, দোললীলা উহা অপেক্ষা নিম্ন স্তরের উৎসব হইলেও অল্পবিস্তর যাত্রী আসিয়া থাকে। যাহা হউক, বেলা সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত দোলোৎসবের কোন সাড়া শব্দ শ্রুতিগোচর হয় নাই। বাসায় বসিয়া আছি সঙ্গের লোকটী রন্ধনশালার কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত, এমন সময় বাহির হইতে অপরিচিত কণ্ঠে ডাক পড়িল—"সীতানাথ বাবু! শীগ্‌গীর বেরিয়ে আসুন, স্বামীজী ক্ষেপেছেন।" নেপথ্যে অপরিচিত কণ্ঠের ভয়াবহ বাণী শ্রবণ করিয়া মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; শুনিবামাত্র ছুটিয়া বাহির হইলাম। ওমা, একি! দেখিলাম, রাজপথ হইতে আমার বাসার দুয়ার পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ণ গলিটুকু জনতায় পরিপূর্ণ, সকলেই রক্তাক্ত কলেবর। দুই তিন জনের হাতে রক্তাক্ত বড় বড় বালতী আর প্রায় সকলের হাতেই

স্বামীজীসহ হোলি খেলা।

পিচকারী ; ঘটনা বুঝিতে বাকী রহিলনা। অবশ্য মুহূর্ত্ত মধ্যেই পলাইবার বুদ্ধি মাথায় যোগাইয়াছিল কিন্তু কাজে খাটাইবার সুযোগ পাইলাম কৈ। এক সঙ্গে অনেকগুলি পিচকারী উদ্যোগী হইয়াছিল, মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমাকে নাস্তানাবুদ করিয়া ফেলিল ; সঙ্গে সঙ্গে হো, হো শব্দে হাসির লহর সমুদ্র গর্জ্জনের ধ্বনিকে বিদ্রুপ করিয়া গগন স্পর্শ করিল। "থাক আর না, বং ধরেছে—ও এখন দলে মিশে সহযোগে কাজ করবে, বের ক'রে নিয়ে এস" শব্দ লক্ষ্য করিয়া তাকাইয়া দেখিলাম আনন্দময় প্রভু আমার পুনরাক্রমণকারীদের প্রতি এই আদেশ বাণী প্রচার করিলেন তখন দুই তিন জন পিচকারী নামাইয়া—আমাকে পাকড়াও করিলেন, অবিলম্বে আমি স্বামীজী সন্নিধানে নীত হইলাম। আনন্দপূর্ণ-চিত্তে তাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম পূর্ব্বক মহোৎসাহে সেই বিরাট বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া বিজয় যাত্রায় বাহির হইলাম। হুড়াহুড়ি, জড়াজড়ি, দৌড়াদৌড়িতে সমস্ত স্বর্গদ্বার প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, আর মাঝে মাঝে সেই বিজয়ানন্দের দিক্‌নিনাদিত হাসি স্বর্গদ্বারবাসী ও পথিকদিগের মধ্যে যুগপৎ উৎসুক ও ভীতি জন্মাইতে লাগিল ধনী-দরিদ্র, দেশী বিদেশী, ছোট-বড়, (স্ত্রীলোক ব্যতীত) কেহই আমাদের অমোঘ আক্রমণ হইতে উদ্ধার পান নাই

ইহার মধ্যে সুখের সংবাদ ছিল কাহারও সহিত কোথাও বিন্দুমাত্র মন কষাকষি হয় নাই অনেকস্থলে এইরূপ কালী কষিতে গিয়া মন কষ উপস্থিত হয় ; আবার স্থানে স্থানে হাত কষাকষি ও চলে ইহাতে শুভঙ্করীর নিয়ম এক হিসাবে বজায় থাকে ; কেননা কালী কষার পরে মণ কষার অঙ্ক বটে এবং হাত কষাটা কালী কষারই অন্তর্গত। অবশ্য আমরা প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিয়া লাঠি কষিতে প্রস্তুত ছিলাম না বটে তবে মৌখিক অঙ্ক কষাতে

নির্ব্বিবাদে হোলি উৎসব সম্পন্ন, পরে জলকেলী ও স্বামীজীর মাতোয়ার ভাব

খুব অভ্যস্ত ছিলাম, অগত্যা তাহাই করিতে হইত কিন্তু সুখের বিষয় সেইদিন কালীকথা ছাড়া শুভঙ্করীর অন্য পাতা উল্টাইতে হয় নাই। আমরা নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গদ্বারে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া বেলা আন্দাজ দুইটায় সময় সমুদ্রে গিয়া পড়িলাম। প্রায় এক ঘণ্টা কাল জলে মাতামাতি করিয়া সকলে তীরে উঠিয়াছি কিন্তু স্বামীজী এখনও সমুদ্রের তরঙ্গাবর্ত্তে খেলা করিতেছেন দলের একজন তাঁহাকে কয়েকবার উঠিতে বলিলেও তিনি সে কথা কাণে তুলিলেন না। ক্রমান্বয়ে স্বামীজীর গতি বহির্ম্মুখে ধাবিত হইল, একটু একটু করিয়া আরও দূরে অগ্রসর হইতেছেন, তখনও আমরা ভাবিতেছি এইবার ফিরিবেন—এইবার ফিরিবেন। কিন্তু কৈ, ফিরিবার যখন কোন লক্ষণই সূচিত হইল না অথচ তিনি অসম্ভব দূরে গিয়া পড়িয়াছেন তখন আমরা চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম—"স্বামীজী ফিরে আসুন! ফিরে আসুন!!" রাম বল! কে সে কথা গ্রাহ্য করে, সরাসর বহির্ম্মুখীন গতিতে তিনি ভাসিয়া চলিয়াছেন। ঘটনার এইরূপ বিরুদ্ধ গতি দেখিয়া সকলে শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলামনা, নিরূপায় হইয়া অগত্যা চীৎকার করিতে করিতে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইলে বোধ হয় একবার আমার কাতর চীৎকার কর্ণে প্রবেশ করিল, অথবা অন্তর্য্যামী আমার প্রাণের কাতর প্রার্থনা বুঝিতে পারিলেন, অমনি গতিও পরিবর্ত্তিত হইল। আমরা উভয়ে বন্ধুবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া তীরে উঠিলাম সেই সময় স্বামীজীর রক্তবর্ণ চক্ষু ও অসংলগ্ন বাক্য আমার ভীতি সঞ্চার করিয়াছিল সঙ্গে করিয়া বাসায় রাখিয়া আসিলাম পরে সংবাদ পাইলাম—আরও ২।৩ ঘণ্টা কাল তাঁহার বিবশাবস্থা কাটে নাই; ঐ সময় তিনি হাসি, কান্না ও সঙ্গীতে যাপন করিয়াছিলেন অহো! সেদিনকার সেই পবিত্র আনন্দের কথা জীবনে ভুলিবার নয়।

আজ পর্য্যন্ত হোলি খেলার সেই আনন্দ চিত্রখানি মূর্ত্ত হইয়া আমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে ; যখনই মনে পড়ে প্রাণ উল্লাসে নাচিয়া উঠে।

হোলি খেলায় নিদারুণ পরিশ্রমে দেহ একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, প্রায় সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত বিছানায় গড়াইলাম। হঠাৎ একটী চিন্তায় দেহের সঙ্গে মনের লড়াই বাঁধিয়া গেল। মন বলিতেছে আহা! আজ দোলপূর্ণিমা, এমন শুভ ও সৌন্দর্য্যময়ী রজনী, এমন করিয়া ঘরের কোণে কাটান কি সাজে ? স্বামীজীর সঙ্গ ব্যতীত আজিকার রজনী একেবারেই নীরস। সমুদ্রতীরে গিয়া তাঁহার সঙ্গে চন্দ্রোদয় দেখা যাক্। দেহ বলিতেছে, আরে বাপু! সমস্ত দিনের হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমে বিছানা ছাড়া চন্দ্রোদয়, অমৃতোদয় কিছুই ভাল লাগে না ; আজিকার রাত্রিটা বিভোর হইয়া নিদ্রা যাও, কাল অন্য ব্যবস্থা করিও। যাহা হউক অবশেষে মনেরই জয় হইল, গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে স্বামীজীর বাসাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। ভাবিয়াছিলাম, স্বামীজীও বোধ হয় আমার মত দেহভারে পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী আছেন, কিন্তু দ্বার সন্নিধানে পৌঁছিবামাত্র আমার সে ভ্রম-কল্পনা দূর হইয়া গেল হারমোনিয়মের সুর সহ মধুর সঙ্গীত ধ্বনী কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হওয়ায় বুঝিলাম, স্বামীজী আত্মবশে আছেন, শ্রমে অভিভূত হন নাই। চন্দ্রোদয় দেখিবার জন্য স্বামীজীর বাসায় বসা হইলনা ; তাড়াতাড়ী বাহির হইবার জন্য অনুরোধ করিলে অনতিবিলম্বে তিনিও বাহির হইয়া পড়িলেন। উভয়ে তখন সমুদ্রতীরে বালুকারাশির উপর আসন গ্রহণ করিয়া নীরবে মনোমুগ্ধকর পূর্ণশশধরের আবির্ভাব দেখিবার জন্য নির্নিমেষ নয়নে সিন্ধুগর্ভে চাহিয়া রহিলাম।

চন্দ্রোদয় দেখিবার জন্য স্বামীজীকে ডাকিয়া সমুদ্রতীরে উপবেশন

অনন্ত সিন্ধুগর্ভ হইতে ধীরে ধীরে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল, চারিদিক দিব্য জ্যোতিতে ভরিয়া গেল একবার সেই চাঁদের দিকে একবার স্বামীজীর মুখের দিকে তাকাইলাম, হৃদয়ে ভাবের একটা আলোড়ন আরম্ভ হইল। গুরু, শিষ্য ও দীক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ও শাস্ত্র বচনের সহিত প্রশ্ন গুলির যথাযথ উত্তর পাইলাম কিন্তু তৃপ্ত হইল মন না। প্রাণের এমন একটী অবস্থার আবির্ভাব হইয়াছে, শুধু কথায় আর তৃপ্তি হইতেছিল না—অতিরিক্ত একটা কিছু চাহিতেছিল চারিদিকে লোকজন, প্রাণের পরদাও যেন খুলিতেছিল না, তাই স্বামীজীকে বলিলাম, চলুন না একটু দূরে বেড়াইতে যাই বিনা আপত্তিতে স্বামীজী [illegible] করিলেন

অতি নিভৃত স্থানে স্বামীজীকে পাইবার জন্য উভয়ে সমুদ্রতীর বাহিয়া গমন

উভয়ে তখন সমুদ্রতীর বাহিয়া বরাবর পশ্চিমাভিমুখী চলিলাম তখন জোয়ার আসিয়াছিল, পূর্ণ চন্দ্রালোকে সমুদ্ভাসিত সমুদ্র যেন বুক ফুলাইয়া খেলা করিতেছিল। শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়ের মত বড় বড় তরঙ্গগুলি পৃথিবীর সহিত আজন্ম প্রতিদ্বন্দ্বীতার কথা স্মরণ করিয়া যেন ফুলিয়া ফুলিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, কিন্তু বেলা ভূমি অতিক্রম করিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধ হৃদয়ে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে কখন বা চুপি চুপি নিকটে আসিয়া সবখানি শক্তি দিয়া হঠাৎ একটী বিরাট তরঙ্গের দ্বারা আবার আক্রমণ করিল, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথিবী তার স্বীয় অচলায়তনে অনায়াসে সেই বিপুল আক্রমন ব্যর্থ করিয়া দিল অতিরিক্ত কিছুটা স্থান সিক্ত হইল মাত্র। এইরূপ হঠাৎ আক্রমণে পৃথিবীর কিছু ক্ষতি না হইলেও আমরা একটু বিপদগ্রস্ত হইলাম—পরিধৃত বসনের কিয়দংশ ভিজিয়া গেল নিরীহ লোক দুইটীকে উত্যক্ত করিয়া সমুদ্র যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল এবার সে একেবারে নিস্তব্ধ, নীরব।

ভাবিলাম, লজ্জিত হইয়া বোধ হয়—সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আর এমন চাঞ্চল্য প্রকাশ করিবে না। আমরা কাপড় ঝাড়িয়া নির্ভয়ে চলিলাম। না, ঐ যে আবার, ওগো—স্বভাব কি কেহ চাপিয়া রাখিতে পারে? আবার সে আস্ফালন পূর্ব্বক উন্নত মস্তকে ধাবিত হইল, দেখিয়া আমাদের সাবধান হইতে হইল। কিন্তু এবার সে কোনরূপ অভদ্রাচরণ করিল না, আমাদের পদপ্রান্ত চুম্বন করিয়া সংযতভাবেই হটিয়া গেল। মনে করিলাম পূর্ব্বদোষ স্খলনের জন্য তার এমন বিনীত ব্যবহার। আর আমরা অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না, ধন্যবাদ দিয়া অগ্রসর হইলাম কিন্তু একি, ও হরি! খল, যে কোন ছল অবলম্বন করিয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে—মানুষকে বিপদগ্রস্ত করে। এবার অতর্কিত একটা ঢেউয়ে আমাদের অনেকটা কাপড় ভিজাইয়া দিল। স্বামীজী বলিলেন—"দুষ্ট ব্যক্তিদের অভদ্রোচিত ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থেকেই তাদের বিশ্বাস করতে হবে। কি করবে তারা, স্বভাব যে তাদের জয় করে বসেছে। আমি যে কোন ব্যক্তিকে এই জ্ঞান নিয়ে ভালবাসি; সময় সময় দুর্ব্যবহারও পাই, তাতে আমাকে বিচলিত করতে পারে না—পূর্ব্ব ভালবাসার এতটুকুও হ্রাস হয় না।" কাপড় নিংড়াইতে নিংড়াইতে আমরা উপরে উঠিয়া নিশ্চিন্ত মনে চলিলাম।

স্বর্গদ্বারের সীমা হইতে প্রায় এক মাইল দূর পর্য্যন্ত নির্জ্জন পথে অগ্রসর হইয়াছি, মাঝে মাঝে দু' একদল নুলিয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রাণীর সাড়া শব্দ পাই নাই। জাল টানিবার সময় মাঝে মাঝে তাহাদের আনন্দ সঙ্গীত কর্ণে যেন মধু বর্ষণ করিতেছিল। সেই পবিত্র সৈকত ভূমিতে

কোলে অবসন্ন দেহে।

উভয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম—কাহারও মুখে কথা নাই। মাঝে মাঝে আমার হৃদযন্ত্রে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব স্পন্দন

হইতেছিল, সেরূপ স্পন্দন আর কখন উপলব্ধি করি নাই; কি জানি তাহাকে ভাবের আঘাত বলে কি না—বলিতে পারিব না তবে, ঊর্দ্ধে নীলাকাশে অফুরন্ত চাঁদের আলো, সম্মুখে অনন্ত অফুরন্ত নীল পারাবার আর পাশেই অফুরন্ত জ্ঞান ও প্রেম ভাণ্ডার প্রভু আমার সশরীরে। এমন নির্জ্জনস্থানে আমি মহাপুরুষের সঙ্গে উপবিষ্ট, এই অবস্থাটী মনে করিয়া মধ্যে মধ্যে পদপ্রান্ত হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত তড়িৎ প্রবাহিত গতি অনুভব করিতেছিলাম—শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছিল একবার মহাপুরুষের মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম, চন্দ্রালোকে সেই প্রশান্ত মুখখানির গাম্ভীর্য্য যেন গম্ভীর সমুদ্রকে হারাইয়া দিয়াছে সে মুখখানিতে যেন কাহারও দাবী নাই—সমস্ত জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, আত্ম পর, হাসি কান্না, ঔদ্ধত্য করুণা, বিধি অবিধি, ত্যাজ্য গ্রাহ্য, জীব শিব প্রভৃতি সকল দ্বন্দের অতীত বলিয়া বোধ হইল। দৃষ্টির মধ্য দিয়া মনের ধারা নির্লেপ গগনবৎ সে মনকে যেন বিশ্ব জগতের কেহ স্পর্শ করিতে সক্ষম নহে। ব্যর্থ স্তুতি, ব্যর্থ চেষ্টা; সেই চির বধির চির নিশ্চিন্তকে কোন্ প্রচেষ্টায় নিজের মত করা যাইতে পারে নিরেট মুখখানির দিকে যতবার চাহিয়া দেখিলাম ততবারই হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। নিজেকে বড় নিরাশ্রয় বোধ হইতে লাগিল, আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলাম না—ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম তবুও ছবির মত সেই মহাপুরুষের মূর্ত্তি নিস্পন্দ,নীরব—বড় নিষ্ঠুর উদাসীনতা ধৈর্য্যের বাঁধ আর একটুও রহিল না—যতই বিফলতা, ততই আকুলতা—গিরিমুক্ত নদীর মত সে অবাধে বহির্গত হইল। মনে হইল যদি সিন্ধুর পরশ পায়, মনে হইল যদি সে তার সম্মুখের বিরাট অস্তিত্বে—অনন্ত ভাব বারিধিতে স্বীয় সঙ্কীর্ণ অস্তিত্ব মিশাইতে পারে। না হয় অর্দ্ধপথে শুষ্ক হইয়া যাউক, এইখানেই আজ প্রাণ শেষ করিব এইরূপ অনেকক্ষণ

ধরিয়া কাঁদিয়াছি, অনেক চোখের জল পড়িয়া গিয়াছে; এমন সময় সর্ব্বাঙ্গে খুব কম্প উপস্থিত হইল—শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। এইবার বসিয়া থাকিবার ক্ষমতাটুকুও লোপ পাওয়ায় অক্ষম শরীর ধীরে ধীরে এলাইয়া পড়িতেছে এমন সময় মহাপুরুষ দু' বাহু পসারিয়া স্বীয় ক্রোড়ে স্থান দিলেন।

বলিতে পারিব না কত সময় এই অপার্থিব আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম—কত সময় এই সুখ সাগরে সাঁতার দিয়াছিলাম; হঠাৎ একটী তরঙ্গের দুর্ব্বিসহ 'ধপাস' শব্দে স্মৃতি ফিরিয়া আসিল

অপূর্ব্ব দীক্ষা।

শিরোভাগে কেশাভ্যন্তরে সঞ্চালিত কোমল হস্ত স্পর্শে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া জ্যোৎস্না স্নাত সেই বদনখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম প্রাণ এক অভুতপূর্ব্ব ভ ব রসে ভরিয়া উঠিল মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলাম, এ যেন আর একখানি মুখ, এ মুখে পূর্ব্বের সে গাম্ভীর্য্য আর নাই, এখন ইহা মোহন মাধুর্য্য রসে ঢল ঢল করিতেছে—কি অপূর্ব্ব দৃশ্য. এমন করিয়া চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া কে অমিয় মাখাইল মুখে—এক মুহূর্ত্তে এমন ভাবান্তর হওয়া কি সম্ভব। এ বস্তুটি কি কল্পিত স্বপ্ন রাজ্যের অমূলক সৃষ্টি, না মূর্ত্ত ভাব-রাজ্যের অপূর্ব্ব বাস্তব বিকাশ। যাহাই হউক আমি যে সে সময় সমস্ত দুঃখ চাঞ্চল্যের হাত এড়াইয়া মহাশান্তির রাজ্যে স্থান পাইয়াছিলাম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। দয়াল প্রভুর মধুর আহ্বানে উঠিয়া বসিলাম, আবার সমুদ্রের সেই বিকট গম্ভীর গর্জ্জন শ্রুতি স্পর্শ করিল বিনয়াবনত শিরে কাতর কণ্ঠে চরণ দুখানি ধরিয়া বলিলাম, "এই নাও আমার দেহ, এই নাও আমাকে। যদি আমার দ্বারা কোন কাজ হ'তে পারে, যদি তোমার ঐ বিশ্বমানবতায় অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু সাহায্য করতে পারি—খাটিয়ে নিও এর হিসাব পত্র, দলিল দস্তব সব তোমার কাছেই রাখ, যদি কখনও ভুল ক'রে

ফিরিয়ে নিতে চাই, খবরদার! তুমি যেন ভুল করোনা, আমার অহংকে কর্ত্তা সাজতে দিও না—কেশে ধরে তোমার পথে চালিয়ে নিও" মহাপুরুষ গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"এই নাও তোমার দীক্ষা।" আমিও বুঝিয়াছিলাম ইহাই আমার দীক্ষা।

৭

## পতিত উদ্ধার

অপরাহ্নে আজ সমুদ্রতীরে বসিয়া গুরুদাস ব্রহ্মচারীকে ধরিয়া বসিলাম—স্বামীজীর চন্দ্রভাগা যাত্রা বা কণারক ভ্রমণ কাহিনী শুনিবার জন্য ব্রহ্মচারী বলিতে আরম্ভ করিলেন—বৎসরান্তে মাঘী শুক্লা-সপ্তমী তিথিতে চন্দ্রভাগার একটী মেলার অধিবেশন হয়; মেলায় বোধ হয় পঞ্চাশ হাজারের অধিক যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে সমাগত যাত্রীদের মধ্যে উড়িষ্যা দেশবাসীর সংখ্যাই অধিক এবং অল্প সংখ্যক বাঙ্গালী। যাত্রীরা সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতে সূর্য্যোদয় দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে প্রবাদ আছে, ঐ দিনে ঐ স্থান হইতে সপ্তাশ্বযুক্ত রথে অরুণ সারথীসহ মূর্ত্তিমান সূর্য্যদেবের দর্শন হয় পুরী হইতে উহা চব্বিশ পঁচিশ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান—সমুদ্রতীরে অবস্থিত। গোযান এবং পদব্রজে ছাড়া পৌঁছিবার অন্য কোন সুবিধা ছিল না স্বামীজীর সহিত অনেকগুলি ভদ্রলোক চন্দ্রভাগা যাত্রী হইয়াছিলেন—তাহারা সকলেই গোশকটের উপর নিজেদের গতি নির্ভর করিয়াছিলেন। মেলার স্থানটী বৃক্ষাদি শূন্য বালুকাময় সমুদ্রের তট, নিকটবর্ত্তী দেড় মাইল দূরে কণারকের মন্দির

স্বামীজীর কণারক বা চন্দ্রভাগা ভ্রমণ কাহিনী ও বিপন্নসেবা

ছাড়া অন্য কোন বাসস্থান সেখানে ছিল না। তবে ছিল, সদ্য নির্ম্মিত কয়েকখানি অস্থায়ী ক্ষুদ্র দোকান, যাত্রীদের এক রাত্রির জন্য চাল, ডাল, কাঠ যোগাইবে বলিয়া। রাত্রি আন্দাজ এগারটার সময় অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল। একে ত শীতকাল তাহাতে আবার অনাবৃত স্থান, যাত্রীদিগের দুরাবস্থার অবধি রহিল না প্রত্যুৎপন্নমতি ও ক্ষিপ্রকর্ম্মী স্বামীজী অন্য উপায় না দেখিয়া সঙ্গীগণসহ গাড়ীগুলি মণ্ডলাকার করিলেন এবং তাহার উপরে সতরঞ্চি চড়াইয়া এমন ভাবে বাঁধিলেন যে, মধ্যে অনেকগুলি লোকের স্থান সংকুলন হইতে পারে পরে খুঁজিয়া খুঁজিয়া প্রপীড়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু ও নিতান্ত বৃদ্ধাদিগকে আনাইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন এইরূপ আরও কতকগুলি শকটারোহী ভদ্রলোকদিগকে উৎসাহিত করিয়া তাহাদের গাড়ীগুলির দ্বারা আরও কয়েকটী আতুরাশ্রম প্রস্তুত করিলেন বৃষ্টি প্রায় এক ঘণ্টা কাল স্থায়ী ছিল। আহা! গরীব দেশের গরীব অধিবাসীরা প্রায় অনেকে এক বস্ত্রে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া এই মেলায় আসিয়া থাকে। দারুণ ঠাণ্ডায় কাঁপিতে কাঁপিতে তাহারা জড়িত কণ্ঠে যখন কাতরোক্তি ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল, তখন স্বামীজী চক্ষু জল সংবরণ করিতে পারেন নাই। সঙ্গীদের সাহায্য ও অন্যান্য ভদ্রবৃন্দের নিকট হইতে সাহায্য সংগ্রহ করিয়া দোকান হইতে বহু পরিমাণে কাষ্ঠ যোগাড় করিলেন ও মেলার স্থানে স্থানে জ্বালাইয়া দিলেন। অনেক নিঃসম্বল যাত্রীরা এই সাহায্যে কৃতার্থ হইল, প্রাণ ভরিয়া দাতার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল অনেকে আসন্ন মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাইল বটে তবুও পরদিন প্রাতে সংবাদ পাওয়া গেল একটী বৃদ্ধা ঠাণ্ডার প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। প্রাতেই আমরা চন্দ্রভাগা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করি। কণারক দর্শনের সময় মন্দিরের সর্ব্বোপরি চূড়ায় স্বামীজী

উঠিয়াছিলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সকলের শেষ স্তবে উঠিবার আদেশ পাই নাই। সঙ্গীদের নিকট কণারকের একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও স্বামীজী বর্ণনা করেন।

সমুদ্রতীরে স্বামীজী, অবিনাশবাবু প্রভৃতি যেখানে বসিয়াছিলেন আমরা তাহার অনতিদূরে বসিয়া চন্দ্রভাগা ভ্রমণ কাহিনী শুনিতে ছিলাম। স্বামীজী মধ্যে মধ্যে আমাদের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন, আমরাও নিশ্চেষ্ট ছিলাম না—বিশেষতঃ আমি তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিখানি নয়নাড়াল করিতে পারি নাই। এইরূপ ব্যবহার আমার অভ্যাসগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল দেখিতেছি স্বামীজী ও অবিনাশবাবু কথোপকথনে বিভোর, এমন সময় জনৈক ভদ্রলোক আসিয়া উভয়কে কি একটা সংবাদ জানাইলেন এবং দুটী একটী প্রশ্নোত্তরের পর উভয়েই এক যোগে গাত্রোত্থান করিলেন গমনোদ্যোগ বুঝিতে পারিয়া ত্বরিত গতিতে আমিও তাঁহাদের পশ্চাদানুসরণ করিলাম। গমন করিতে করিতে অবিনাশবাবু বলিতেছেন, "চলুন দেখা যাক্, তবে ভরসা বাদ দিয়ে, এখন একবার ভাল ক'রে হরিনাম শুনিয়ে দিন, এ ছাড়া আর কিছু উপকার করবার সময় নেই"

অনতিদূর অগ্রসর হইয়াই আমরা একখানি খড়ের চালার সিমেণ্ট করা বারান্দায় উঠিলাম সমুদ্রতীরে যে সমুদয় ঘরে দরিদ্র প্রবাসীরা
স্বামীজী নিঃসঙ্কোচে আসিয়া অল্প ভাড়ায় বাস করেন, ঘরখানি সেই
যক্ষ্মা রোগীর শয্যা প্রান্তে, শ্রেণীর অন্যতম। অগ্রগামী নূতন ভদ্রলোকটী দ্বার
অন্যান্য সকলে দ্বার সন্নিধানে পৌঁছিয়া এমনভাবে একপাশে দাঁড়াইলেন
সন্নিধানে দণ্ডায়মান। যাহাতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারিলাম, গৃহাভ্যন্তরে যাওয়ার মধ্যে কিছু সঙ্কোচের কারণ বিদ্যমান আছে। কিন্তু স্বামীজী কিছু দ্বিধা বোধ না করিয়া অবাধে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাশে

একটী গবাক্ষ দ্বার দিয়া দেখিলাম, একখানি ছোট চৌকিতে একজন মুমূর্ষাবস্থাপন্ন রোগী এবং শয্যাপ্রান্তে স্বামীজী উপবিষ্ট। আর ছিলেন এক কোণে দণ্ডায়মানা একটী প্রৌঢ়া রমণী মূর্ত্তি, বসনাঞ্চলে ঘন ঘন নয়ন মার্জ্জনা করিতেছিলেন রোগীর মৃত্যু-কালিমা মাখা ক্ষীণ মুখখানির উপর স্থাপিত স্বামীজীর করুণ নয়ন দুটীতে সমবেদনা ও সহানুভূতির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছিল স্বামীজী সস্নেহে রোগীর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে রোগ যন্ত্রণা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন, আর রোগী ক্ষীণকণ্ঠে ধীরে অতি ধীরে নিজের অবস্থা ব্যক্ত করিতে লাগিল অবিনাশবাবুকে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম,রোগীটী সংক্রামক যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত। সুস্থ হইবার আশায় আজ প্রায় সপ্তাহ যাবৎ সমুদ্রতীরবাসী হইয়াছেন। অবস্থা দরিদ্র, সঙ্গে সেবা শুশ্রূষার জন্য একমাত্র তাহার মাতৃষসা—ঐ স্ত্রীলোকটি ব্যতীত অন্য কেহ ছিল না দুর্ভাবনা সজ্জাগৃত লাগিয়াই ছিল, তাহার উপর সহায় শূন্য অবস্থায় পুরী পৌঁছিয়া নিদানাবস্থাপন্ন রোগী সহ স্ত্রীলোকটীর বিপদের মাত্রা যে চরমে উঠিয়াছিল, সে কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। স্বামীজী কোন সূত্রে জানিতে পারিয়া সাহায্যের নিমিত্ত গুরুদাস ব্রহ্মচারীকে নিযুক্ত করেন; সেও তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতেছে। অদ্য প্রাতঃকাল হইতে রোগের বাড়াবাড়ী, রক্ত উঠিবার মাত্রা খুব বেশী। অবিনাশবাবুর নিকট এইরূপ বিবরণ শুনিতেছি এমন সময় রোগী সামান্য কাশীতে গিয়া রক্ত উঠিল, অমনি দুই হস্তের দ্বারা স্বামীজী সম্মুখস্থিত পাত্রে সেই রক্ত ধরিলেন—বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বা ঘৃণার ভাব তাঁহার মুখে বা ব্যবহারে প্রকাশ পাইল না। আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাহি করিতে লাগিলাম; অবিনাশবাবু স্বামীজীকে কিছু নিষ্ফল ইঙ্গিতও করিলেন কিন্তু কি হইবে, মহান বিশ্বপ্রাণ-হৃদয়ে সেই ইঙ্গিত বুঝিবার কোন ইন্দ্রিয় ছিল কিনা বুঝিলাম না। রোগীর ব্যবস্থা ও

সাবধানতার জন্য উপদেশ দিয়া স্বামীজী গাত্রোত্থান করিলেন শুনিলাম, রাত্রিতে আরও দুইবার আসিয়া তিনি রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতে রোগীর অবস্থা একেবারে চরমে দাঁড়াইল সংক্রামক ব্যাধির ভীতি সাধারণ অপেক্ষা আমার কিছুমাত্র কম না থাকিলেও

মুমূর্ষুর প্রতি উপদেশ।

কৌতুহল চাপিয়া রাখিতে পারি নাই; এই রোগীটীর অন্তিমাবস্থার সহিত স্বামীজীর অদ্ভুত ব্যাপার কিরূপ আকার প্রাপ্ত হয়, দেখিবার জন্য স্বামীজীর সহিত সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এই সময় রোগীর আত্মীয়া স্ত্রীলোকটী খুব কাঁদিতে সুরু করিয়াছিলেন, স্বামীজী গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক মিষ্ট প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া রন্ধনশালার দিকে বসাইয়া রাখিলেন পরে প্রশান্ত বদনে শয্যা প্রান্তে বসিয়া যখন রোগীর মুখের দিকে তাকাইলেন, তখনও তাহার জ্ঞান একেবারে লোপ পায় নাই। স্বামীজী তাহাকে প্রায় কোলে করিয়া লইয়া বসিলে, রোগী অতি ধীরে, দীনহীনের মত স্বামীজীর মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিল আহা! সেই করুন দৃশ্য আজিও যেন আমার চোখের উপর ভাসিতেছে রোগী অতি ক্ষীণ কণ্ঠে অতি কষ্টে প্রশ্ন করিল—"আমার এই অসময়ে নিতান্ত আপনার মত এমন স্নেহ দেখাচ্ছেন, কে আপনি?"

প্রভু বলিলেন আমি তোমার পর নই, তুমিও আমার পর নও; যা'ক সে কথা, এখন তোমার প্রাণের ভিতর কি রকম হচ্চে বল দেখি? কারুর কথা মনে পড়ছে কি? রোগী উত্তর করিল—খুব কষ্ট। দম আটকে আসছে!! স্ত্রীর জন্য একটু চিন্তাও হচ্চে, মরণ ভয়টা সব চেয়ে বেশী

প্রভু বলিলেন—ভগবানের কথা কি মনে হচ্চে না? তিনি ছাড়া মানুষের প্রকৃত আপনার কেউ নেই ত।

রোগী বলিল—ও ! আপনি এমন সময় ভগবানের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন ? মহাশয়, তাঁর নাম করবারও অধিকার যে আমার নেই ! ওগো ! আম যে মহাপাতকী, আমি করি নাই এমন পাপ নাই, যদি কেউ সে সময় ভগবানের কথায় আমাকে প্রবোধ দিতে যে'ত, আমি বিদ্রূপের হাসি হাসতুম্। না আর পাচ্ছি না,—বড় কষ্ট ! নিশ্বাস ফেলতে পাচ্ছি না ক হবে আমার !

প্রভু বলিলেন—বল কি তুমি ? ভগবান যে পতিত পাবন ! ছিঃ ! তাঁর মহিমায় অবিশ্বাস করতে আছে ? একমাত্র পাতকীরাই ভগবানের দয়ার পাত্র—পুণ্যাত্মার ত সুকৃতি আছে,তাঁদের উপর দয়ার আবশ্যক কি ? কাঙ্গাল যে,সেই দয়া কর ব'লে আঁচল পাতে,ধনী কি কারুর দুয়ারে যায় ?

প্রভু প্রায় আধ ঘণ্টা ব্যাপী স্নেহ মমতার ভ্রান্তি জ্ঞান, দেহের অনিত্যতা, আত্মার নিত্যত্ব, জীব ও ভগবানের নিত্য সম্বন্ধ, নামের মহিমা, অন্তকালে নাম স্মরণে বা ভগবদ্ভাব ধারণে অনিবার্য্য মুক্তি এই সমুদয় উপদেশ দিলেন। বুঝাইবার শক্তি সে সময় এমন দেখিয়াছিলাম, যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। দেশ বিখ্যাত বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তির বক্তৃতা শুনিয়াছি, বহু সিদ্ধ হস্ত লেখকের লেখনীতে কল্পনার নিখুঁত চিত্র আঁকিতে দেখিয়াছি, কিন্তু সে দিন যাহা দেখিলাম তাহ অভাবনীয় শক্তির বিকাশ বাক্য সেখানে মূর্ত্ত হইয়া ভাবের এক সজীব ছবি ফুটাইয়া দিয়াছিল ; অধিক আর কি বলিব আমার এমন ভীরু প্রাণটীও সে দিন মরণকামী হইয়াছিল। আমার সে দিনকার সে ভাব কবিব ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে বলিতে হয়—"এখন যদি মরতে না পাই তবে আমার মরণ ভাল।"

ইহার পর দয়াল প্রভু, পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"এখন মনের অবস্থা কেমন ?"

রোগী উত্তর করিল—"বেশ শান্তি আর কোন চিন্তা নাই, যন্ত্রণাও কমে গেছে—মরণকে আর ভয় করি না। ওগো, অযাচিত করুণাময়, আপনিই কি আমার সেই পতিত পাবন!

এইবার রোগীর নয়নে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল বুঝিলাম ইহা আনন্দাশ্রু অতঃপর দয়াল প্রভু সেই ভাগ্যবানকে কলুষনাশন ভগবানের পবিত্র নামোচ্চারণ করিতে আদেশ করিলেন। স্বামীজার নয়নের স্থির দৃষ্টি তাহার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে আকর্ষিত করিয়াছিল; আর তাঁহার করকমল উহার বক্ষস্থলেই অর্পিত ছিল এইবার স্বামীজী মধুর স্বরে তারক ব্রহ্মনাম জপ করিতে আরম্ভ করিলেন; সেও তাঁহার সহিত অনুচ্চস্বরে একতানে গাহিতে লাগিল—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" আমিও আর থাকিতে না পারিয়া সহযোগে গান ধরিলাম—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" আমার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, অঙ্গে একপ্রকার কম্প উপস্থিত হইল, নয়নের জল বাধ ভাঙ্গিয়া বুকের উপর গড়াইল দেখিতে দেখিতে রোগীর রোগ ক্লিষ্ট কালিমা মুছিয়া গিয়া মুখে দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল—বাস, এইবার সব স্থির। আহা! লোকটীর সেই স্থির শান্ত দৃষ্টি তখনও আমার প্রভুর মুখের উপরে নিবদ্ধ, অতি সহজ স্বাভাবিক ভাবেই তাহার প্রাণন ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়াছিল। একেবারে শেষ মুহূর্ত্তেও তাহার জিহ্বা হইতে ভগবানের পবিত্র নামোচ্চারণ করিতে দেখিয়াছি মৃত্যুর পরেও সেই প্রশান্তভাব আর অর্দ্ধনিমিলীত দৃষ্টি; ঠিক যেন ধ্যান মগ্ন যোগীর মত ভাব সমাধিতে নিমগ্ন। কে বলিবে এই ব্যক্তির মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে ওগো, জগৎবাসী তোমরা একবার আসিয়া দেখিয়া যাও আজিকার এই শুভমুহূর্ত্ত কবির কল্পনাকে সত্য করিয়াছে, স্বপ্নকে জাগ্রত করিয়াছে, মরণকেও

জীবন দিয়াছে যদি মরিতে হয়, এমনি করিয়া মরিবার আকাঙ্ক্ষা কর। ঐ যে কথায় বলে—"জপ তপ কর কি মরণে হুসিয়ার," আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। এই যে আজন্ম পাপ চেষ্টায় ব্রতী মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন চির পতিত, সে আজ কোন সুকৃতি বলে এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইল? আমি জোর গলায় বলিতে পারি—সে আমার প্রভুর দয়ায়! সে আমার দয়াময়ের দয়ায়!! পতিত পাবনের অকারণ সহানুভূতিতে!!

ঠিক এই সময়ে একটা বড় ঢেউ আসিয়া সমুদ্রতীরে আছড়াইয়া পড়িল। একটা দমকা বাতাস দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ঘরখানিতে পাগলের মত ঘুরিয়া গেল। আমি ছুটিয়া গিয়া প্রভুর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলাম।

বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে দাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া সকলে বাসায় ফিরিলাম। স্বামীজী শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন, এতদ্ব্যতীত অবিনাশবাবু, ডাক্তার বাবু প্রভৃতি অনেকেই আনন্দের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। রোগীর আত্মীয়া অসহায়া স্ত্রীলোকটীকে কয়েকদিনের মধ্যেই দেশে পাঠান হয়। স্বামীজীর আদেশানুসারে ডাক্তারবাবু সঙ্গে যাইয়া রাখিয়া আসেন

৮

## মহাভাব ও বিদায়

স্বামীজীর সহিত অবিনাশবাবুর প্রায়ই তর্কযুদ্ধ ঘটিত, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি সে যুদ্ধ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইত, অথচ উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম ভালবাসা। উভয়ের কোন্দল দেখিবার জন্য আমরা সর্ব্বদাই উৎসুক হইয়া থাকিতাম আবার অন্তরালে উভয়েই উভয়ের প্রশংসা করিতেন কিন্তু দেখা হইলেই যত বিবাদ। ভালরূপ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইত, প্রতি কথাতেই

অবিনাশবাবু ও স্বামীজীর 'তরঙ্গ' ও তদুপলক্ষে আনন্দভোজ

স্বামীজীর উপর অবিনাশবাবুর অগাধ শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পাইত, স্বামীজীও অবিনাশ বাবুর গুণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন অবিনাশ-বাবুর নিন্দা স্বামীজী সহ্য করিতে পারিতেন না। ইহাতে যে তাঁহার অকারণ পক্ষপাতিত্ব দোষ ছিল তাহাও নহে। তিনি গুণের আদর করিতেন অবিনাশবাবুর এমন কতকগুলি গুণ ছিল যাহা সাধারণের মধ্যে থাকে না—স্বামীজী তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। একদিন গুরুদাস ব্রহ্মচারী বলিলেন, "অবিনাশবাবু অযথা অন্যায় তর্ক করেন, স্বামীজীর সহিত তিনি সঙ্গত ব্যবহার করেন না" গুরুদাসের এই মন্তব্য স্বামীজীর কর্ণে পৌঁছাইলে স্বামীজী তাহাকে শাসন করিয়াছিলেন স্বামীজীর মতে অবিনাশবাবুর তর্ক তাঁহার আনন্দোদ্দীপক, আর ব্যবহারও অতি প্রিয়, ভদ্র ওদিকে অবিনাশবাবুর নিকটেও কেহ স্বামীজীর নিন্দা করিতে পারিতেন না আমরা উভয়ের এই অদ্ভুত ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইতাম, কিছুই বুঝিতে পারিতাম না দেখিয়া শুনিয়া একদিন আমি ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলাম—"আপনাদের অন্তরে প্রেমের তার আর বাহিরে দেখ্‌ছি বিরোধাভিনয়; আপনারা সত্বরই একটা কিছু সম্বন্ধ পাতিয়ে বাইরের বিরোধটা মিটিয়ে ফেলুন।" সকলে মিলিয়া অনেক সমালোচনার পর পরিশেষে নির্দ্দিষ্ট হইল "তরঙ্গ" পাতান উচিত। স্বামীজী বলিলেন—ঠিকই হয়েছে; একই সাগরের বিরাট বিপুল দেহের আমরা দুটি "তরঙ্গ', এর একটী মাথা নাড়লে অপরটীও মাথা না নেড়ে থাক্‌তে পারে না তরঙ্গাকারে আমাদের দুটীকে পৃথক দেখ্‌লেও জলরূপে উভয়ে অভিন্ন সত্বা,—বাইরে পৃথক, অন্তরে এক—মাথামাখি প্রেম, তরঙ্গে তরঙ্গে ঘাত প্রতিঘাতও অনিবার্য এবং সেই সূত্রে কোন্দল গর্জ্জনে দিক মুখরিত হবে। এ কথাটাও আপনারা সকলে স্মরণ রাখবেন। তারপর ভবিষ্যতে যখন আমাদের এই তরঙ্গাকার ভেঙ্গে যাবে

তখন আমরা সাম্য প্রশান্ত অনন্ত বারিধিতে একাকারে যুক্ত হব; তখন এক অদ্বিতীয়, অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মসমুদ্র স্বমহিমায় ব্যক্ত থাকবে" যাহা হউক সর্ব্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত লইয়া তরঙ্গ পাতাল হইয়া গেল, এইবার ভোজের পালা এক বন্ধু আমাকেই চাপিয়া ধরিলেন, অপরাধ—আমিই প্রথমে কথা উত্থাপন করিয়াছি আনন্দের সহিত বন্ধুটীর প্রস্তাব অনুমোদন করিলাম পরদিন নির্ব্বিঘ্নে মহানন্দে ভোজের ব্যাপার সমাধা হইল

স্বামীজীর বাংলা প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদে আমার মানসিক অবস্থা।

একদিন সংবাদ পাইলাম স্বামীজীর বাংলায় ফিরিবার দিন সমাগত হইয়াছে। অবিলম্বে বাংলা হইতে কোন ভক্তের আবির্ভাব হইবে আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নয়নতারাটী উপাড়িয়া লইয়া যাইবে। স্পষ্ট কথা বলিতে কি স্বামীজীর বাংলা প্রত্যাবর্ত্তনের এই সংবাদটা আমার আদৌ সুখকর হয় নাই। আপনারা বলিতে পারেন—"কেন? সঙ্গে সঙ্গে আপনিও বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অসুখের সমস্ত কারণ নিবৃত্তি হইয়া যায়।" কিন্তু তাহাতে একটু অসুবিধা ছিল, স্বাস্থ্য চিন্তাটা তখনও একেবারে বাদ দিতে পারি নাই হয়ত ভাবের ঘোরে পড়িয়া সেটা ত্যাগ করিতেও খুব বেগ পাইতে হইত না। কিন্তু স্বামীজী নিজেই বলিলেন আরও একমাস তোমার থাকা দরকার। সুতরাং ডবল চাপ পড়িয়া আরও একমাসকাল পুরী বাস করিতে বাধ্য হইলাম স্বামীজীর পূত সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইব,- চিন্তাটায় আমার মানসিক স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতীক্রম ঘটাইয়াছিল কেমন করিয়া দিন কাটাইব সেই চিন্তাটাই প্রবল এই দীর্ঘকাল স্বামীজীর সহবাসে থাকিয়া তাঁহাকে যে কত বড় অবলম্বন করিয়া তুলিয়াছিলাম তাহা আজ অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইল আজ যেন চারিদিক শূন্য ও নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ হইতেছিল অবশ্য, অবিনাশবাবু আছেন, আরও

অনেক বন্ধু জুটিয়াছিল, কিন্তু ক· সে কথা মনে করিয়া ত প্রবোধ পাইতেছি না। মনে হইতেছিল এক স্বামীজীর অভাব বুঝি সমগ্র পৃথিবী এক হইয়াও ঘুচাইতে পারিবে না। এক একবার ভাব হৃদয়কে ছাপিয়া উঠিতেছিল, ভাবিতেছিলাম স্বীয় স্বাস্থ্য চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া আরাধ্য দেবতার সহিত এক যোগে আনন্দরাজ্যে যাত্রা করি। কিন্তু স্বামীজীর নিদারুণ আদেশ মনে করিয়া তাহাতে সাহসী হইলাম না। এইরূপ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও সমস্যার মীমাংসা করিতে না পারিয়া অবশেষে অদৃষ্টের উপরেই নির্ভর করিতে হইল উৎকণ্ঠিতচিত্তে সেই সঙ্কটাপন্ন দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম

ডাক্তারবাবু সেই অসহায়া স্ত্রীলোকটীকে লইয়া অদ্য প্রাতেই বাংলা যাত্রা করিয়াছেন, গুরুদাস ব্রহ্মচারীও ডাক্তারবাবুর জিনিষ পত্রাদি লইয়া সঙ্গেই গমন করিয়াছে। উভয়ে নৈহাটী ষ্টেশনে পৃথক হইয়া গুরুদাস নবাবগঞ্জে এবং ডাক্তারবাবু সেই মৃতের দেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন। পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ডাক্তার বাবু নবাবগঞ্জেই স্বামীজীর জন্য অপেক্ষা করিবেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্বামীজীর বাসায় অনুসন্ধান লইয়া জানিলাম, তিনি অবিনাশবাবু ও কয়েকটী ভদ্রলোক সমুদ্রতীর বাহিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন বৈঠকখানায় দুটী অপরিচিত যুবককে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া সন্দেহ সঞ্চার হইল ইহারা কোথা হইতে আসিল? আলাপ করিবার সুযোগ পাইলাম না, কাজেই বাধ্য হইয়া সমুদ্রতীরে আসিয়া বসিলাম। সান্ধ্যতিমিরে পৃথিবী তখন ডুবিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু পশ্চিমাকাশে একখানি ছিন্ন মেঘের উপর তখনও সূর্য্যের রক্তছিটা দেখা যাইতেছিল অদূরে সুমধুর কণ্ঠে কে গাহিতেছিল—

দুইটী অপরিচিত যুবক।

তোমায় মন্দির দুয়ারে আজি এসেছি ভরিয়া ডালা।
মম মানস-কুঞ্জ-কুসুমে এনেছি গাঁথিয়া মালা।
লহ অধমেরি দীন উপহার
খুলে দাও প্রভু অগৃত দুয়ার
ভুবন রঞ্জন রূপ নেহারী ভুলে যাই ভব জ্বালা
তব বিমোহন বাঁশরী শুনিয়া
সকল পাশরী এসেছি ছুটিয়া
ছাড়িয়া ধূলাখেলা,
অনাথ শরণ দেহ দরশন বয়ে যায় মম বেলা
সুখে হয়ে থা'ক নিখিল বিশ্ব
তুমি গুরু আর আমি শিষ্য
রহিব সুধু জাগি
ওহে প্রিয়তম কেব তোম সম মম অনুরাগী,
দাও খুলে আঁখি বিশ্বরূপ দেখি
সেবকে তোমার দিও নাহি আর তোমাবে করিতে হেলা

গানটী তৎকালে আমাব হৃদয়ের সব অংশটাই জুড়িয়া বাজিয়াছিল। এক মনে অবাক হইয়া গান শুনিতেছি এমন সময় গায়কের কণ্ঠস্বর নড়িয়া গেল, বুঝিলাম গায়ক গাত্রোত্থান করিলেন আমিও উঠিয়া স্বামীজীর বাসাভিমুখে অগ্রসর হইলাম, স্বামীজী আসিয়াছেন কিনা দেখিবার জন্য আশ্চর্যের বিষয় এই যে অগ্রগামী গায়কটীও গান গাহিতে গাহিতে স্বামীজীর দুয়ারে উপস্থিত হইলেন। তখন ত্বরিত গমনে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম ইহারা অন্য কেহ নহেন; পূর্ব্ব দৃষ্ট সেই দুটী যুবক। অনায়াসেই বুঝিতে পারিলাম গায়ক ইহাদেরই একজন

দুই এক কথায় যুবক দুইটীব সঙ্গে আলাপ করিয়া লইবার উপক্রম

করিতেছি, এমন সময় অবিনাশবাবু খুব ব্যস্তভাবে আসিয়া হাঁক্ পাড়িলেন আহ্বানানুসারে বাহির হইয়া আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"কি কচ্ছেন আপনারা! শীগ্‌গীর বেরিয়ে আসুন, স্বামীজী কেমন হয়ে পড়েছেন।" অবিনাশবাবু এমন ভঙ্গিতে কথাটী বলিয়াছিলেন তাঁহাকে আর প্রশ্ন করিবার অবসর পাইলাম না, অবিলম্বে তাঁহার সহিত আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায় আসিয়া অবিনাশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপারখানা বলুন ত'? তিনি বলিলেন—আঃ মশায়! অত বুঝিবার ক্ষমতা আমার নেই। জানেন ত স্বামীজীর ধরণটাই একটু অদ্ভুত গোছের—সাধারণের মত নয়, এই সন্ধ্যে বেলায় আমরা কয়েকজন বেড়াতে যাচ্ছিলুম—বেশ আনন্দের সহিত আমরা যাচ্ছিলুম, তার পর ঐ যে গবর্ণরের বাড়ীটা আছে জানেন ত ঐখানে গিয়ে সকলে বেশ বৈঠক করে বসা গেল। বাঁকুড়ো জেলা নিবাসী একজন ওস্তাদ গায়ক আমাদের সঙ্গে ছিলেন; দোষের মধ্যে আমি তাঁকে একটা গান গাইবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। এমন হবে জান্‌লে কিছুতেই আমি সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করতুম না আর সে ভদ্রলোকও বেছে বেছে কোথা থেকে এক গোপী প্রেমের গান ধরলেন। ইতিপূর্ব্বে খুব হাসির লহর উঠ্‌ছিল, তার মধ্যে স্বামীজীর গলার আওয়াজটা সবচেয়ে উচুতে ছিল রাধা মাধব, যেমন ভদ্রলোক গান সুরু করলেন, অমনি স্বামীজী একেবারে নিশ্চল মূর্ত্তি। একেবারে স্থাণুর মত অচল, সমুদ্রের মত গম্ভীর বাবা! সে মূর্ত্তি দেখলে ভয় হয়। তারপর আর কি, অবিশ্রান্ত নয়ন বারি বর্ষণ, শেষে একেবারে সীমা অতিক্রম করে ভূমিতে লুটোপুটি আর মর্ম্ম বিদারক ক্রন্দন ধ্বনী

সমুদ্রতীরে ভাব মূর্চ্ছিত স্বামীজীর সংবাদ লইয়া অবিনাশ বাবু।

সে দৈন্যতা দেখলে অতি কঠিন হৃদয়ও দ্রব হয়—করুণার উদ্রেক হয়। যখন দেখলুম একেবারে সংজ্ঞা লোপ হ'য়ে গেল তখন বড়ই ভাবিত হলুম। পরিশেষে উপায়ান্তর চিন্তা করিতে না পেরে একখানা গোযানের ব্যবস্থা করা হয়েছে—দুজন ভদ্রলোক সঙ্গে আছেন। আচ্ছা, আপনারা বলতে পারেন কি, স্বামীজীর কি কিছু মাথার দোষ আছে? এইরূপ কথা প্রসঙ্গে আমরা কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই আমাদের প্রভুবাহক গো যান খানির সহিত সাক্ষাৎ হইল, সঙ্গে সঙ্গে সকলে নীরবে ফিরিলাম।

গো যানে করিয়া সেই মূর্চ্ছিত দেহ বাসায় আনয়ন অনির্ব্বচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমার বিস্ময় ও সমস্যা। হাসির কথা।

বাসার অনতিদূরে গাড়ীখানি আসিয়া দাঁড়াইলে আমরা ধরাধরি ভাবে স্বামীজীকে বাসায় নিয়া চৌকিতে শোয়াইয়া দিলাম আহা! সর্ব্বাঙ্গ এলান—শরীরের গ্রন্থিগুলি যেন একেবারে এড়াইয়া গিয়াছে নয়ন প্রান্ত দিয়া এখনও মাঝে মাঝে সলিল ধারা পতিত হইতেছিল—দৃষ্টি স্থির আন্দাজ অর্দ্ধ ঘণ্টা এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর হঠাৎ বিভীষিকাময় এক উচ্চহাসিতে আমরা সকলেই চমকাইয়া উঠিলাম কেননা, অমনতর বিশাবস্থার ভিতর দিয়া হঠাৎ অত বড় উচ্চ হাসি বাহির হইবার ধারণা আমাদের মাথায় বিন্দুমাত্র উদয় হয় নাই, তাই অকস্মাৎ এই অস্বাভাবিক হাসিতে আমাদের চমকিত হইবারই কথা। সে হাসির তুলনা হয় না—কিয়দংশে সামঞ্জস্য আছে বলিয়া আমি দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রথম হইতেছে বিকারগ্রস্ত রোগী; তাহার হাসি এইরূপ অকস্মাৎ আবির্ভাব ও তিরোভাব হইলেও চোখে এমন প্রফুল্লতা বিদ্যমান থাকে না পাগলের হাসির মধ্যে আনন্দ ও অস্বাভাবিক ভাব থাকিলেও এমন অশ্রু সহ আনন্দ তাহাতে পাওয়া যায় না—এটা দ্বিতীয় তুলনা।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত হইতেছে ভাং সেবীর হাসি অতিরিক্ত ভাং সেবন করিয়া মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে যদি কেহ হাসিতে আরম্ভ করে সেই হাসিতে যেমন অস্বাভাবিক ভাব বিদ্যমান থাকে এ হাসিতে তদপেক্ষাও অধিক কিছু ছিল তবে সিদ্ধি খোরের দৃষ্টান্তটা সব চেয়ে জবর, তাই বোধ হয় লোকে সর্ব্বসিদ্ধি নিপুণ শঙ্করকে সিদ্ধিখোরের দলেই ফেলিয়া দেয় যাহা হউক এমন প্রাণ খোলা, বুক ভাঙ্গা হাসি কেহ কখনও হাসিতে পারে কিনা বলিতে পারি না ভাবিতেছিলাম এই বস্তুটীর অভ্যন্তরীন চেতনা টুকু এখন যে মহাভাবে বিজড়িত, কে সেই রহস্য ভেদ করিতে পারে? ইচ্ছা হইতেছিল—এই মুহূর্ত্তে জগতবাসীর দ্বারে দ্বারে ছুটিয়া গিয়া প্রতিজনের হাতে ধরিয়া পায়ে পাড়িয়া বলি—ওগো, তোমরা দেখিয়া যাও, কেহ যদি এই আভনব প্রাণটুকুর অভ্যন্তর একটু বুঝিয়া লইতে পার। ওগো, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতের! ওগো, কবি ও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা! আমার বোধ হইতেছে তোমরা প্রত্যেকেই একটা নূতন জিনিষের সন্ধান পাইবে—যাহা কখন কেহ পাইয়াছ কিনা? আবার ভাবিতেছিলাম—না, এমনি করিয়া ত আর একজন কাঁদিয়া হাসিয়া প্রেমে ভাসিয়া ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন সে আজ প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসরের কথা। শুনিতে পাওয়া যায় তখন নাকি এমন করিয়া প্রেমের বন্যা বহিয়াছিল আহা! আমার ভাগ্যের অবধি নাই, আজ আমি সেই শুনা কথা প্রত্যক্ষ করিলাম। অনিমেষ নয়নে সেই প্রেম সিন্ধুর তীরে দাঁড়াইয়া ভাবের অনন্ত লহর হেরিতে লাগিলাম।

হাসির উপর হাসি, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ। সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া তরঙ্গের দিকে দৃষ্টি করিলে যেমন কোন কারণ দেখা যায় না, তেমনি এই হাসি তরঙ্গেরও কোন কারণ আমাদের বুদ্ধি গোচর হইল না একবার একটা হাসির খুব বড় তরঙ্গ উঠিল এটা আর কিছুতেই

থামে না। হায়! অফুরন্ত সেই হাসির তরঙ্গটী এবার আর প্রাণটুকুকে ফেলিয়া গেল না—কোন্ সুদূরে লইয়া গেল আমাদের দৃষ্টি তাহার অনুসরণ করিতে না পারিয়া নিস্পন্দ দেহটী লইয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিলাম। হায়! হায়!! ইহাতে যে প্রাণের চিহ্নমাত্র নাই। ওগো, একি! সর্ব্বাঙ্গ যে স্থির হইয়া গেল, হাতের আঙ্গুলগুলি যে আঁকিয়া বাঁকিয়া যাইতে লাগিল। প্রভো! এ তোমার কি বিভীষিকাময় খেলা? এতক্ষণ আমার প্রাণ ভাবলীলা দর্শনেই বিভোর ছিল কিন্তু আর হইল না; যুগপৎ ভীতিও বেদনা উপস্থিত হইয়া আমাকে উদ্বিগ্ন করিল। মুখের উপর সভয় দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ পূর্ব্বক বসিয়া আছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম অধরোষ্ঠ যেন ঈষৎ কম্পিত হইল, বুকে বুঝি হৃদপিণ্ডের ক্রিয়াটাও একটু অনুভূত হইল ও হরি, ঐ যে চোখে আবার জলধারা প্রবাহিত। বস্ত্রাঞ্চল দিয়া মুছাইতে আরম্ভ করিলাম কিন্তু হায়! মূর্খ আমি, কাহার সাধ্য সে স্রোত মুছাইয়া শুকাইতে পারে? আমার বস্ত্রাঞ্চল ও তাঁহার উপাধানটী একেবারে ভিজিয়া গেল। পূর্ব্বে যেমন হাসির মাত্রা চরমে উঠিয়াছিল, এবার কান্নাও সেইরূপ সীমা অতিক্রম করিল—বাস, সব স্থির। প্রাণটীকে যেন এক অজানা শান্তিরাজ্যে তুলিয়া দিবার জন্য তাহার এত বড় ব্যস্ততা। তাহাই হইল, সর্ব্বাঙ্গ নিস্পন্দ হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্পন্দন ধ্বনিও অন্তর্হিত হইল পূর্ব্ববৎ কিছু সময় প্রাণের কোন চিহ্ন আর দেখিতে পাইলাম না। পরে যখন শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনুভূত হইল, তখন তাঁহার বদন মণ্ডল প্রশান্ত এবং গাম্ভীর্য্যের খনি। অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত পদ্মের মত নয়ন দুটী ধীরে ধীরে উন্মীলন করিলেন, এই সময় তাঁহাকে যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বোধ হইতেছিল। কিন্তু নিদ্রিত ব্যক্তির

হাসি কান্নার চূড়ান্ত অর্থাৎ উভয়ের সীমায় সমাধি। ভাবের আবিল বা অর্দ্ধ বাহ্য। প্রলাপ, গান, বাল্যভাব ও যোগ সমাধি।

ঘুম ভাঙ্গিবার পর তাহাতে যেমন একটা জড়তা লক্ষিত হয়, এই অদ্ভুত পুরুষটীতে অভাব ছিল সেইটীর চক্ষুরুন্মীলন করিলেও স্থানীয় কেহ বা কাহারও প্রতি তাঁহার কোন সম্ভ্রম হইতেছিল না তখনও আবিলতা ছিল, বাহ্যাবস্থা ফিরিয়া আসে নাই পোয় পনের মিনিটকাল এই অবস্থায় থাকিয় হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন এবং সকলের মুখপানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতে লাগিলেন। ক্রমান্বয়ে মুখ ফুটিল। প্রথমে এমন কতক-গুলি শব্দ করিলেন যাহা আমাদের নিকট নিতান্ত পাগলামী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল তারপর গাত্রোত্থান করিয়া যখন গান ধরিলেন তাহাও একেবারে স্বাভাবিক বলিয়া বোধ করিতে পারিলাম না। "ওগো, কেমনে বুঝাব আমি কত ভালবাসি তোমায়," প্রায় বিশ মিনিট কাল এই একটী পদই চলিল গাহিতেছেন আব কথনও কাঁদিতেছেন কখনও হাসিতেছেন, কখন বা অঙ্গ দোলাইতেছেন। কিছু বুঝি আর না বুঝি তবে সবটাই ভাল লাগিতেছিল তখন তাঁহার সমুদয় ব্যবহার মাধুর্য্য মাখা এক অপূর্ব্ব অভিনয় অবাক হইয়া নটবরের এই মোহন লীলাভিনয় দেখিতেছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এক অপূর্ব্ব ভাব মাধুর্য্য আস্বাদ করিতেছি তাহার সবগুলি ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না

গান বন্ধ হইল, সঙ্গে সঙ্গে বাল্যভাব প্রকটিত। তখনকার চাপল্য, হাসি, আবদার সমস্তই শৈশব স্থানীয় কখন গালবাদ্য, কখনও করতালি। কখনও আধ আধ কথা—এই সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া আমাদের প্রাণ যে কি পরিমান আনন্দ রসে ভাসিতেছিল তাহা বুঝাইবার জন্য বিফল চেষ্টা করিব না যাহা হউক প্রভুর এই বাল্য লীলা শেষ হইলে ঘন গাম্ভীর্য্য ভাব ফুটিয়া উঠিল, আবার তিনি গান আরম্ভ করিলেন কিন্তু এবার সে মাধুর্য্য মাখা প্রেমসঙ্গীত নহে—ইহা জ্ঞান গম্ভীর ব্রহ্ম সঙ্গীত স্থির গম্ভীর ভাবে প্রভু আমার গাহিতেছেন—

বিশ্ব ভুবন বঞ্জন ব্রহ্ম পরম জ্যোতি,
অনাদি দেব জগপতি প্রাণেরি প্রাণ

*   *   *   *   *   *

গান শেষ হইতে না হইতে গাম্ভীর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইল। পূর্ব্ব হইতেই যোগীর মত মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসিয়াছিলেন গাম্ভীর্য্য ক্রমান্বয়ে এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল—ঠিক যেন বৈশাখের ঘন নবীন মেঘ আকাশ পূর্ণ করিয়া ঝুলিয়া পড়িলে যেমন হয় মুখখানিতে আমরা সেইরূপ গুরু গাম্ভীর্য্যের প্রকাশ দেখিয়া ছিলাম ধীরে ধীরে সব স্থির—প্রাণাপাণের অধিকার দূর হইয়া গেল এই সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বোধ হইল তাঁহার চক্ষুদুটি কোন দৃশ্যাবলম্বন ব্যতীত স্থির হইয়াছে, বিনা অবরোধে প্রাণন ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়াছে এবং কোন বস্তু অবলম্বন ব্যতীত মন নিশ্চল হইয়াছে স্বামীজী এখন আত্মারাম, নিষ্কল ব্রহ্মানন্দে বিভোর।

অপরিচিত যুবক দুইটীর সহিত পরিচয়।

অনেক রাত্রি অবধি জাগিয়া পরদিন প্রাতঃভ্রমণে বিপত্তি ঘটিয়াছিল, তাই—একেবারে সার্দ্ধ নব কিম্বা দশটার সময় সমুদ্র-স্নানোপলক্ষে স্বামীজীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত। তখন যুবক দুইটী মিলিত কণ্ঠে গাহিতেছিলেন—

কবে, তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব, তোমারি রসাল নন্দনে
তাপিত এ চিত, করিব শীতল তোমারি করুণা চন্দনে।
কবে, সুখ দুখ দুটী চরণে দলিয়া
যাত্রা করিব শ্রীহরি স্মরিয়া,
চরণ টলিবেনা, প্রাণ গলিবেনা, কাহারো আকুল ক্রন্দনে।
কবে, তোমাতে হয়ে যাব আমার আমি হারা
তোমারি নাম নিতে নয়নে ববে ধারা
দেহ শিহরিবে, আকুল হবে প্রাণ, তোমারি পুলক স্পন্দনে।

গান শেষ হইল কিন্তু ভাবের ঘোর আর কাটে না অতঃপর সেই ভাব মগ্ন ভক্ত-সভাকে উদ্বোধিত করিলাম প্রথমে আমি—শব্দ উচ্চারণ করিয়া ; প্রশ্ন করিলাম "স্বামীজী কোথায় ?" খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ যুবকটী উত্তর করিলেন—"ঠিক জানিনা, তবে শীঘ্রই আস্‌বেন বলে অনুমান হয়। ( মৃদু হাস্যে ) আপনার নাম বোধ হয় "সীতানাথ বাবু ?" আমি—"আজ্ঞা হাঁ।" যুবক—"স্বামীজীর নিকট পূর্ব্বেই আপনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেয়েছি, কিন্তু সাক্ষাৎ বাক্যালাপের সুযোগ ঘটে নাই "

যুবক আমাকে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন, অনেক অনুসন্ধান লইলেন, আমিও অনলসভাবে যথা সম্ভব ভক্ত দুইটীর বিবরণ সংগ্রহ করিলাম, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম, প্রশ্নোত্তরকারী যুবকটীর নাম "কৃষ্ণ" এবং দ্বিতীয়টীর নাম "হরি"। দেখিলাম, স্বামীজীর প্রধান ভক্ত স্বরূপে কৃষ্ণ কিছু অভিমানও পোষণ করে হরি একটু গোবেচারা গোছের, সে একরূপ কৃষ্ণের পরিচালনায় চালিত যাহা হউক, তখনকার মত স্বামীজীর উপর উভয়ের ভক্তি শ্রদ্ধার ত্রুটী দেখিলাম না। উভয়ে নবদ্বীপবাসী উপসংহারে জানিতে পারিলাম, তাহারা বাংলা রূপী মথুরা হইতে অক্রূরের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আগমন করিয়াছে—স্বামীজীকে লইবার জন্য। হঠাৎ শুনিলে হয়ত প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিত, কিন্তু সংবাদটা একরূপ পুরাতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাই মন খানিকটা সংযত হইয়াছিল। বিশেষতঃ অপরিচিত যুবক দুইটীকে দেখিয়া কিছু কিছু অনুমানও করিয়াছিলাম মন পাতলা হইবার এই কারণগুলি বিদ্যমান থাকিলেও একেবারে নির্ব্বিকার চিত্তে খবরটাকে হজম করিতে পারি নাই ; কেমন একটু অসোয়াস্তি বোধ হইতেছিল, অন্য মনস্ক হইবার অছিলায় কৃষ্ণের মারফৎ স্বামীজীর কিছু বিবরণ শুনিবার জন্য ধরিয়া বসিলাম বলিতে ভুল হইয়াছে, কৃষ্ণ ও হরিদাস স্বামীজীকে

"ঠাকুর" শব্দে অভিহিত করে পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতেছি,—এই জন্যই পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছি, "ভবিষ্যতে হয়ত আরও কোন নূতন নামে আবিষ্কৃত হইবে "

কৃষ্ণ বলিল—শ্রীশ্রীঠাকুরের অসাধারণ ব্যবহারের পরিচয় দেওয়া আমার সাধ্যাতীত বিশেষতঃ যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, সমুদয় বলিতে যাইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে মোটামুটি দুটা একটা কথা শুনুন—আমি ও অনৈক ডাক্তার পথিপার্শ্বে কোন নিভৃত স্থানে স্বামীজীকে প্রথম দর্শন করি। বাক্যালাপের পূর্ব্বেই তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তিখানি দেখিয়া আকৃষ্ট হই, পরে বাক্যালাপ করিয়া একেবারে মোহিত হইয়া যাই নিরালম্ব ও আহারান্বেষণে অমনোযোগ দেখিয়া কিছু অর্থ সাহায্য করিতে চাই, আশ্চর্য্য হইলাম,—তিনি তাহা স্পর্শ করিলেন না দেখিয়া ত'রপর প্রায় মাসাবধি কাল স্বামীজীকে দুটী দুটী মুড়ি খাওয়াইয়া রাখি অন্নাহারের প্রস্তাব করিতে সাহস কার নাই

কৃষ্ণের নিকট স্বামীজী সম্বন্ধে দুটী পুরাতন সংবাদ

আমাদের পরিচিত একজন গ্রাজুয়েট্ গৃহ শিক্ষক ছিলেন ; অন্যদিকে তিনি বৈদান্তিক পণ্ডিত ও বটে। খুব তর্কবাজ, নবদ্বীপ নিবাসী অনেক পণ্ডিত মহাশয়েরা তাঁহার ভয়ে ভীত পরীক্ষার জন্য একদিন তাঁহার সহিত স্বামীজীকে ভিড়াইয়া দিলাম ; তর্কযুদ্ধের অবসানে মাষ্টার মহাশয় স্বামীজীর অনুগত হইলেন। তিনি বলিলেন—"ইনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, বেদ বিধির অতীত, খাদ্যাখাদ্যের কোন বিচার নাই—তুমি ভক্তি পূর্ব্বক যাহা দিবে তাহাই গ্রহণ করিবেন।" প্রথমদিন মাষ্টার মহাশয় স্বামীজীকে অন্ন ভিক্ষা করাইয়া আমাদের ভয় ভাঙ্গিয়া দিলেন। আরও দুই একজন পণ্ডিতের সহিত তর্ক বিচার হইয়াছিল। স্বামীজীর আরও অনেকানেক অদ্ভুত ভাব দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি " কৃষ্ণের নিকট এইরূপ অপূর্ব্ব

চরিতামৃত পান করিতেছি এমন সময় হঠাৎ স্বামীজী আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—"কিরে কেষ্টা দর বাড়াচ্ছিস নাকি? যত ব্যবসাদারের দলবে। আরে হতভাগা ও বেটাও যে মস্ত বড় একটা ব্যবসাদার, ওর কাছে কেনা দরটা বলে ফেললে তুই নিজেই ঠ'কে যাবি" (সকলের হাস্য) এইরূপ আরও দুটী একটী হাস্য রসের কথা হইবার পর যাত্রার সময় ধার্য্য করিবার কথা উঠিল। অনেক আলোচনার শেষে পরদিন প্রাতঃকালীন প্যাসেঞ্জার ট্রেণে যাওয়ার কথাই বহাল রহিল শেষ দিন বলিয়া আজ অবিনাশবাবু প্রভৃতিসহ স্বামীজীকে লইয়া সমুদ্র-স্নানে নামিলাম

আগামী কল্য হইতে প্রিয় স্বামীজীকে সুদীর্ঘ কালের জন্য হারাইয়া ফেলিব, ভাগ্যে আবার দেখা হইবে কিনা, তাহাও অনিশ্চিত। এইরূপ ভাবিয়া আজ প্রায় অবিচ্ছেদে স্বামীজীর সঙ্গ করিতে থাকিলাম নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে বদন হইতে নয়ন ফিরাই নাই। দিন এইরূপ কাটিয়া গেল, রাত্রি প্রায় ১২টার সময় যখন স্বামীজীর নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, তৎকালীন আমার চিত্তের অবস্থা বর্ণনাতীত অতি প্রিয় বস্তু বিচ্ছেদের বিরহ-সন্তপ্ত হৃদয় ছাড়া আমার সে সময়ের প্রাণ অন্য কেহ বুঝিতে সক্ষম হইবেন না কবির ভাষায় বলিতে হইলে, প্রসিদ্ধ কথাটী মনে পড়ে—

বিরহের আশঙ্কায় উগ্র চিন্তা

"কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

একমাত্র ভুক্তভোগীই তাহা বুঝিতে সক্ষম বিশেষতঃ আমার এই সর্ব্বনাশা ভালবাসার সঙ্গ—এরূপ সঙ্গ-বিচ্ছেদ যাতনা ব্যক্ত করিতে কোন মহাকবিও সমর্থ হইবেন কিনা বলিতে পারিনা সুতরাং সে দিনের সেই কাল নিশি আমি যে অব্যক্ত যাতনার মধ্য দিয়া যাপন করিয়াছিলাম, তাহা অব্যক্ত।

আপনারা হয়ত আমার এই নারী-স্বভাব-সুলভ দুর্ব্বলতা দেখিয়া বিদ্রূপের হাসিতে দিক মুখরিত করিবেন, কিন্তু কি করিব ? বুঝিয়াও আমি নিরুপায় কি যেন এক মহা যাদুমন্ত্র বলে আমি আমাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। শতবার স্বীয় দুর্ব্বলতার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জিত ও সংযত হইবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু বৃথা চেষ্টা নদী যেমন একবার পার্ব্বত্যসীমা অতিক্রম করিয়া সমতল ভূমিতে পদার্পণ করিলে আর তাহাকে কেহ বাধা দিতে সক্ষম হয় না, আমার দ্রবিভূত ভাবও সেইরূপ সংযমের বন্ধুর পার্ব্বত্যসীমা অতিক্রম করিয়াছিল, সে প্রবাহের গতি রোধ করিতে পারি নাই যদি কেহ বলেন—আধ্যাত্মিক রাজ্যে এমন মায়া মোহের সম্বন্ধ কেন ? আমি তাহার বিরুদ্ধে ভক্তিদর্শনের কোন সিদ্ধান্ত উত্থাপন করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব না, জানাইব কেবল আমার ভাব প্রবণ হৃদয়ের দুর্বাপনীয় অবাধ্যতার পরিচয়। শাস্ত্রীয় যুক্তি-তর্কের আয়োজন করিলে কোন পক্ষীয় প্রমাণে হয়ত উহা মায়ার প্রকোপ, অন্য পক্ষে হয়ত ( বলিতে সাহস হয় না ) প্রেমাঙ্কুরের সূচনা বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে ; আমি কিন্তু কাহারও পক্ষে ভোট না দিয়া আপনাদিগকে জানাইতে চাহি—ইহা ঐ অদ্ভুত ঠাকুরটীর প্রাণ-মন হরণকারী নিদারুণ প্রভাব।

সমস্ত রজনী শয্যায় ছট্‌ফট্ করিয়া প্রভাতে পরিশ্রান্ত কলেবরে নয়ন পল্লব মুদ্রিত করিলাম কিন্তু আনন্দময় সুষুপ্তির ক্রোড়ে স্থান পাইলাম

সুখ স্বপ্ন

না, মনময় স্বপ্ন রাজ্যের মুগ্ধকর দৃশ্যে চিত্ত আটকাইয়া গেল হইতে পারে, স্বাপ্নিক পদার্থ কাল্পনিক মিথ্যার প্রতীক, অথবা কাকতালীয়বৎ কতকগুলি পূর্ব্ব সংস্কারের সংযোগ ; কিন্তু সেইদিন সেই মধুর স্বপ্নের মধ্য দিয়া আমি যে মধুর আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছিলাম, তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না।

মানস রাজ্যের অত্যুৎকৃষ্ট কল্পনা স্বর্গীয় নন্দনকাননাদির সৌন্দর্য্য বর্ণনা শুনিয়াছি, কিন্তু আমার সেই স্বপ্ন রাজ্যের সহিত তুলনা হইতে পারে না। দেখিলাম, নিবিড় দুর্ভেদ্য অন্ধকার—গাঢ় জমাট হইয়া যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, গগনমণ্ডপে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি কোন প্রকার জ্যোতির পকাশ ছিল না; সমগ্র বিশ্বটাই যেন একটা প্রকাণ্ড নিরেট আঁধারের স্তুপ। কি জানি কেমন করিয়া কোন সূত্রে সেই অন্ধকার-সমুদ্রে আমি এক ঘন-সন্নিবিষ্ট বিটপী-সমাকীর্ণ সুবিশাল অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। একেত' সমগ্র বনস্থলী কণ্টকাকীর্ণ, তাহাতে আবার লতিকা বেষ্টিত দৃঢ়বদ্ধ পা দুখানি ছাড়াইয়া যাইবার উপায় নাই চতুর্দ্দিকে মাংস লোলুপ হিংস্রকের তীব্র দৃষ্টি আমাকে যেন দগ্ধ করিতেছে, আর আমি প্রাণপণে পরিত্রাহী ডাক ছাড়িতেছি। এমন সময় একবার বিদ্যুতের মুহূর্ত্ত দীপ্তিতে অনেকাংশ বনভূমি নয়ন গোচরীভূত হইল, দেখিলাম, আমার ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত আরও অনেক প্রাণী ম্লান ক্লিষ্ট বদনে মহারণ্যে নিবদ্ধ এইবার তাহাদের আকুল চীৎকার শ্রবণে আসিয়া পৌঁছিল; আমিও আর স্থির থাকিতে পারিলাম না চোখের জলে বুক ভাসাইয়া নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম,—হে ভয় হারী সঙ্কট নাশন—মধুসূদন! বড় বিভীষিকাময় স্থান, উদ্ধার কর প্রভো! নিজের অদৃষ্টে যা' হবার তাই হউক, কিন্তু ঐ যে দীনহীন জনগণের মর্ম্ম ভেদি আর্ত্তনাদ—ইহাত' আর সহিতে নারি!—বুক যে ফেটে যায় দয়াময়!!" অকস্মাৎ পূর্ব্বাকাশে অলক্ত-রাগ রঞ্জিত অপূর্ব্ব সুনির্ম্মল ছটা দেখিয়া বুঝিলাম—দয়ালের টনক নড়িয়াছে। গগনে তপনের উদয় হইয়াছে, এইবার আমাদের মুক্তির সুযোগ উপস্থিত। পথঘাট সমুদয় নয়ন গোচরীভূত হইল, বন্দীগণও আজ মুক্ত। পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল সে এক

মোহন মেলা, মহানন্দে ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগলি হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে সেই জ্যোতির দিকে তাকাইয়া রহিলাম। যাহার আভাসেই আমরা মুক্তি লাভ করিয়াছি, এইবার সেই মূর্ত্ত জ্যোতিকে সাক্ষাৎ করিবার আশায় সকলে উৎফুল্লিত। ঐ যে! ঐ ত'!!—দেখা যাইতেছে আহা! কি অপরূপ দৃশ্য! ইহা ত' লোক লোচন গোচরীভূত নিত্যোদিত সেই পুরাতন সূর্য্য নহে, এ যে এক অভিনব মূরতি সুশ্রী সম্পন্ন কমণ্ডলু হস্তে গৈরিকাবৃত জ্যোতির্ম্ময় তনু ঝলমল করিতেছে সাম্য মন্ত্র লিখিত শান্তি পতাকা তাঁহার দ্বিতীয় হস্তে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বিশ্ববাসীকে মধুর বাণীতে আজ আহ্বান করিতেছেন মস্তকে মনোহর গৈরিক উষ্ণিষ শোভিত, বদন প্রশান্ত। আর নয়ন দুটী চন্দ্র সূর্য্যের মত জ্ঞান ও প্রেম সুধার আকর। বহু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নামোচ্চারণ করিয়া আর একবার এককালে জন-মণ্ডলী জয়ধ্বনি করিল, আমি সস্মিত নয়নে চাহিয়া দেখিলাম—এ যে আমারই সেই দয়াল প্রভু, প্রেমাবতার স্বামীজী।

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল,—দেখিলাম সূর্য্যের আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে

প্রাতে দেখা গেল শারদীয়াকাশের ন্যায় হৃদয়াকাশ নির্ম্মল, কোনরূপ উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নাই। ছুটিয়া গিয়া ভক্ত দুইটীর সঙ্গে স্বামীজীর আসবাব

বিদায়

পত্র গুছাইতে লাগিলাম বিদায় ভোজের নিমন্ত্রণ ছিল অবিনাশবাবুর বাসায়, সভক্ত স্বামীজী ভোজন সমাপন করিয়া যথা সময়ে ষ্টেশনে পৌঁছিলেন সঙ্গে ছিলাম আমরা কয়েকজন ট্রেণ প্রস্তুত হইয়াই ছিল—আসবাব সহ স্বামীজীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম স্বামীজীর বিদায় কালীন কয়েকটী বাণী আমার হৃদয়ে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রহিয়াছে, কস্মিনকালেও তাহা ভুলিতে পারিব না স্বামীজী বলিলেন—"গঠন কার্য্য হুজুকে হয় না, স্থায়ী সাধনার

দরকার। জীবন তৈরার জন্য শোধনের জন্য—চাই ধৃতি, চাই তিতিক্ষা। যদি সঙ্গ লাভে ধন্য বলে মনে কর—যদি মৎসম্বন্ধীয় পরিচয়ে গৌরব অনুভব কর, তবে চাই তোমার নিজে পবিত্র থাকা পবিত্র প্রাণটাই গুরুদক্ষিণার উপযুক্ত।" হায়! সময় কাহারও সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া থাকে না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল, অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রভুর গৈরিক বাসনাঞ্চল আমার নয়ন পথ আলোকিত করিয়া পবন-হিল্লোলে উড়িতে দেখা গিয়াছিল

উপসংহারে আপনারা আর কি শুনিবেন? এখন যাহা বলিতে যাইব তাহাই অপ্রাসঙ্গিক যাহা হউক, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেইদিনই স্বামীজীর পরিত্যক্ত বাড়ী ভাড়া লইয়া বাসা বদলাইয়া ফেলিলাম। বাকী দিনগুলির মধ্যে স্বামীজীর স্মৃতি আমার চিন্তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল

সম্পূর্ণ।